# দুষ্টুবুদ্ধি বুদ্ধিজীবী — হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ!

অমিত দাশ

# দুষ্টুবুদ্ধি বুদ্ধিজীবী —
# হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ!

অমিত দাশ

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

Dustubuddhi Buddhijibi -
Hindu-musalman Samparka O
Sampradayik Rabindranath !
by Amit Das

প্রকাশ ঃ অগাষ্ট, ২০০৬

প্রকাশক ঃ অরুণ ঘোষ

বর্ণসংস্থাপন ঃ কেকা দাশ
কলকাতা - ৭০০০৯৪

মুদ্রক ঃ বসুমুদ্রণ
১৯ এ, শিকদার বাগান লেন,
কলকাতা - ৭০০০০৪

মুল্য ঃ বোর্ড বাঁধাই - ৫০টাকা
পেপার ব্যাক - ৪০টাকা

# উৎসর্গ

শ্রী নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ও

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ - কে

# প্রস্তাবনা

ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা একবিংশশতকের সকালে যুক্তিশীল মানুষের একান্ত হতে পারে না। আমার ধর্মের রঙ লাল-সবুজ কিংবা কালো বজায় রইলো কিনা তা নিতান্তই আপতিক। তবুও নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকে যে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দিই, তা কোন ধর্মীয় পরিচয় বহন করে না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ- "হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয় বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো একটি বিশেষ ধর্ম নয়। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্যে দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।" (আত্মপরিচয়)

আস্তিক-নাস্তিক কিংবা নিতান্ত অজ্ঞেয়বাদী হলেও সমাজে আমার 'হিন্দু' পরিচয় গ্রাহ্য। চার্বাকপন্থীরাও বৃহত্তর হিন্দুসমাজের বাইরে নন।

ইদানীং অবশ্য 'হিন্দু' কথাটিই কেমনভাবে যেন প্রায় গালাগালির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। যতই আমরা মুক্তমনা হই না কেন, সমাজে 'অনাথ' শিশুর মর্যাদা যেমন একান্তই তলানিতে অবস্থিত, একজন নির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য প্রবক্তা বা গুরু না থাকায় 'হিন্দু'র অবস্থাও সেইরকম। ফলে হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খৃষ্টান মতান্তর-মনান্তরে তিরস্কারের সম্মার্জনী হিন্দুর উপরই বর্ষিত হয়। আর সকল হিন্দুই 'আমি তো সম্মর্জনীর লক্ষ্য নই' ভেবে আনন্দে উদ্বাহু হন।

অতীতে গোঁড়া হিন্দু আর বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যাঁকে কারণে-অকারণে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজেদের মতের চুড়ান্ততা প্রমাণে উৎসাহী সেই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বহু আগেই বলেছেন ঃ- " হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ হয়ে থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায়, তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্যফল পাওয়া যায় না। কারণ আমি 'হিন্দু' নই বলিলে

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই তাহা হইতে একলা পাশ কাটাইয়া আসি।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ-১৬৭)

যাই হোক্, অন্তত ধর্মীয়, ক্ষেত্রে 'কর্তাভজা' না হওয়া, 'গুরুবাদী' না হওয়া, নানা বিচিত্রমুখী ভাবনায় ভাবিত হওয়া যে হিন্দু মুক্তসমাজের প্রধান শক্তি হওয়া উচিত ছিল, তা হিন্দুর দুর্বলতার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। হিন্দুর নিপীড়নে তাই সকলেই রবীন্দ্রনাথ যেমন বর্ণনা দিয়েছেন তেমনভাবে ঃ- "উয়ো তো বেনিয়াকো লড়কী "* বলে পাশ কাটিয়ে যেতে তৎপর।

মুসলমান (একটি বড় অংশ) মানসিকতায় বিচ্ছিন্নতা (অন্তত ইসলাম বর্ণিত দার-উল-হারাব্ — ভারতবর্ষে) বীজের উপ্তিই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সুম্পর্কের প্রধানতম অন্তরায় — এই সত্যটি মেনে নিতে অস্বীকৃত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী। মুসলমানের বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্য যারা তথাকথিত 'হিন্দু অসহিষ্ণুতাকে' ডাইনী করে তুলেছেন তাদের কাছে আজ অন্তত এ প্রশ্ন রাখাই যায় যে কমিউনিষ্ট দেশ চীনে মুসলমানপ্রধান বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা ও সন্ত্রাসের যে বাড়বাড়ন্ত, তা কোন চীনা 'হিন্দু'র অত্যাচারের ফল?

সাংবাদিক সুমিত মিত্র 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছেন ঃ- "ভারতে যে-ইসলামি মৌলবাদ অযোধ্যা-বাবরি ঘটনাবলীর পর মাথা চাড়া দিয়েছে তার অভিমুখ সম্পূর্ণ দেশজ। নরেন্দ্র মোদীর উপমাটি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে বলা ভাল ওটি গেরুয়া ক্রিয়ার সবুজ প্রতিক্রিয়া।"

শ্রী মিত্র কিন্তু জানালেন না কাশ্মীরে কয়েকদশক ধরে যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম কিংবা নিদেনপক্ষে বোম্বাই বিস্ফোরণ কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া?

আসলে 'Pan-Islamism' সম্বন্ধে যাদের ধারণাই নেই অথবা কৌশলগত কারণে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে তা গোপন করতে চান ;তাঁরা আজ হিন্দুর ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রের স্বল্পতায়, নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিতে মুসলমান চরিত্রের অনুপস্থিতিতে, এমনকী ঋত্বিক ঘটকের

---

*........."আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু-লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। একবার এইরকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য কর কেন?' সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, 'উয়ো তো বেনিয়াকী লড়্কী।' 'বেনিয়াকো লড়্কী' হিন্দু আর যে ব্যক্তি তার হরণ ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। ....... (অ্যালফেড মঞ্চে পঠিত রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি প্রকাশিত হয় প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সংখ্যায়।)

ছবিতে 'হিন্দু' আইকন ব্যবহারের বাড়াবাড়ি খুঁজে তথাকথিত আত্মসমালোচনার মহানুভবতার নামে যে আত্মঘাতে মেতে ওঠেন, তার পেছনে সাময়িক কোনো বিশেষ সম্ভাবনার হাতছানি প্রচ্ছন্ন আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। এঁরাই ছৌ-নাচে গণেশ বন্দনায় আতঙ্কিত হন, মঙ্গলকাব্যে হিন্দু দেবদেবীর উপস্থিতিতে গেল-গেল রব তোলেন। যে মূঢ়তায় জাতির সংস্কৃতি, পৌরাণিক গাথা-গল্প এদের কাছে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল বলে পরিগণিত হচ্ছে, সেই মূঢ়তা অবলম্বন করে কোন মূঢ়মতি 'হিন্দু' যদি একদিন ভেবে বসেন নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় 'খোদা' কথাটি রয়েছে বলে পরিত্যাজ্য, জসিমুদ্দিনের নকশীকাঁথার মাঠে যে কবরের কথা রয়েছে তা ইসলামগন্ধী কিংবা শামসুর রাহমানের 'বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতায় রোজার রাতের বর্ণনায় মুসলমান 'আইকন'- এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে কুলোর বাতাসে দূর করতে চান সেই সমস্ত অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি, তাহলে আজকের 'হিন্দু' আইকন দূর করতে উৎসাহী নবনিরপেক্ষতাবাদীদের (Neo Secularist)প্রচেষ্টারই সম্প্রসারণ হবে মাত্র।

এদেশে মুসলমান বিচ্ছিন্নতা কারণ অনুসন্ধান করতে হলে যে সমস্ত তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থারাজী ইসলামিক দর্শনের মূল উৎস, এখনও ইসলামী জীবনচর্চার প্রধানতম চালিকা শক্তি সেই বইগুলির গভীরে যাওয়া প্রয়োজন।

যে সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বিশ্বাসকে তরবারীর জোরে মুছে দিতে উৎসাহী ইসলামের, "......... বিধর্মীদের হয় ধর্মান্তরিত করবে, নয় কোতলে আম বা সমূলে নিপাত" (পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রদত্ত রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখা 'বস্তুবাদীর ভারতজিজ্ঞাসা', পৃ-৫৪) নীতিতে বিচ্ছিন্নতার উৎস খুঁজে না দেখে ;সে বিষয়ে মুসলমান ধর্ম অবলম্বনকারী মুক্তমনা মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, যথার্থ কারণ ছাড়াও 'হিন্দু'-কে গালি দিতে ব্যস্ত হয়ে এমনকী মিথ্যারও আশ্রয় নিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাদের সম্পর্কে সচেতন হবার দিন এসেছে।

মুক্তমনের অধিকারী মুসলমান লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা আজ সরব হচ্ছেন, এবিষয়ে আবদুল ওদুদ, রেজাউল করিম প্রমুখের পথ অবলম্বন করেই। শাহরীয়ার কবির, সালাম আজাদ কিংবা এপার বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মইনুল হাসান প্রমুখ এই উদ্যোগে যথার্থ নিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদীদের সঙ্গেই থাকবেন — এমন আশ্বাস তাদের লেখার মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

ধর্মবিশ্বাস যা একান্ত ব্যক্তিগত তা জোর করে অপরের কাঁধে চাপালে তার মূল্য যে নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে যায়, এ বোঝার শিক্ষা এই একবিংশশতকেও অর্জন করার পরিবর্তে নিজের বিশ্বাসেই বিশ্বকে অভিভূত করতে চাইলে তা প্রতিরোধ করাই সঙ্গত।

মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ খুঁজতে প্রায়শই হিন্দুদের মুসলমান সমাজের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে থাকা, তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে অনীহার কথা বলা হয়েছে। 'খাবলে নেওয়া' এই ইতিহাসবোধ এ বিষয় ভেবে দেখতে চায়নি যে বস্তুত হিন্দুসমাজের, বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের এই অনীহা মাত্র মুসলনামদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য তা নয়। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার কদর্যতার বিরুদ্ধেই তো রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ - বিবেকানন্দের সাধনা। নিতান্ত ডোম কিংবা মেথরের জীবিকা যে মানুষেরা গ্রহণ করতেন তারা তো বটেই, ধনে ও মানে যথেষ্ট উন্নত সাহা, সুবর্ণবণিকেরা (বাংলায়) পর্যন্ত হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হতেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর' -এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

জাতের নামে বজ্জাতির শিকার সাধারণ হিন্দুর মতো মুসলমানও হয়েছেন — শুধুমাত্র মুসলমান হবার জন্যই নয়। তাছাড়া হিন্দুর এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মগ্রন্থ নেই যেখানে হিন্দু ছাড়া অপর ধর্মে বিশ্বাসীর প্রতি ঘৃণার বাতাবরণ গড়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুর মুসলমান বিরোধিতা শাস্ত্রসম্মত নয় — সামাজিক। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর যথার্থ সমালোচনা করতে গিয়ে 'জাজিম' তুলে মুসলমানের বসার স্থান নির্দিষ্ট করার বিষয়ে যা বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্মের বাধন আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজ তা সংশোধন করে নিচ্ছেন। হিন্দুর মেয়ে মুসলমান যুবককে বিবাহ করলে বহু হিন্দু হয়তো এখনও খুশি মনে তা মেনে নিচ্ছেন না, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বিধাও কেটে যাচ্ছে। মুসলমান সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অন্দরমহলে খোঁজ নিলে জানা যাবে সেখানে হিন্দু ঘরের মেয়েদের সংখ্যা নেহাত অগ্রাহ্য করবার মতো নয়।

অপরপক্ষে মুসলমান সমাজে 'কাফের' হিন্দুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যযুগীয় মুসলমান বাধা আজও অক্ষুণ্ণ আছে একই ভাবে।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর খুব বেশী রকম হিন্দু নির্যাতনকারী ছিলেন এমন নয়। হিন্দুর মন্দির এবং মূর্ত্তি কিছু ভাঙ্গলেও মোটামুটিভাবে হিন্দুদের সঙ্গে সদ্ভাব

বজার রেখে চলার বিষয়ে পিতা আকবর-এর নীতি মেনে চলতেন। এই রকম একজন তুলনামূলকভাবে মৃদু হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান সম্রাট তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন ঃ- "শুক্রবার ৮ই রাজাউর-এ শিবির পড়েছিল। প্রাচীনকালে ওখানকার অধিবাসীরা ছিলেন হিন্দু............। সুলতান ফিরুজ তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ........... হিন্দুদের সঙ্গে এদের খুব ঘনিষ্ঠতা এবং এই দুই সম্প্রদায়ে বিবাহাদি চলে। হিন্দু মেয়ে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হিন্দুর ঘরে কন্যা দান, আল্লা না করুন, তা একেবারেই চলে না। আমি হুকুম দিলাম যে তখন থেকে সেরকম কাজ অর্থাৎ হিন্দুকে কন্যা দান করা চলবে না। যদি কেউ করে তবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। " (তুজুক-ই- জাহাঙ্গীরী, কল্পন সংস্করণ, পৃ ৪৩৪-৪৩৫)

চারশো বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। গঙ্গা - যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। মুসলমান সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে কি ? হিন্দু-মুসলমান যুবকদের এক সম্মেলনে মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরী আইয়ুব, বিচারপতি মাসুদ, অধ্যাপক মামুদ সহ বহু বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে বর্তমান গ্রন্থের লেখক হিন্দু-মুসলমান সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য একে অপরকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে না রেখে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিলে কিভাবে মুসলমান যুবকেরা (যারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত) সকলে একসাথে উঠে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন, তার সাক্ষী এখনও দু-চারজন রয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই সমর্থন জানানোয় বর্তমান লেখকের মুখরক্ষা হয়েছিল সত্য। কিন্তু যে বাস্তব সত্য সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল নানা তত্ত্বকথায় তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। এমনকী চলচ্চিত্রেও মুসলমান ঘরের মেয়েকে হিন্দুযুবকের প্রেমিক হিসেবে উপস্থাপিত করাতে বিক্ষোভের ফলে চলচ্চিত্রটিকেই প্রত্যাহার করতে হয়েছে এই অতি আধুনিককালেও !

ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাষ্ট্রপতিও তাঁর নিজের পরিবারের এক কন্যার পাণিপ্রার্থী হিন্দু যুবককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার শর্ত জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

আধুনিক বাংলার অতিআধুনিক ও প্রগতিমনস্ক গায়কের ধর্ম পরিবর্তন করে বিবাহ করার ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমস্যার গভীরতা কতটা! একথা কি বিশ্বাস করতে হবে ঐ গায়ক বিশেষ ধর্মপ্রাণ অথবা ধর্মের তুলনামূলক (comparative) বিচার করেই মুসলমান হয়েছেন? জানা যাবেনা মুসলমান

ধর্মের অন্যতম মৌলিক ক্রিয়া সুন্নৎ-এর পথপরিক্রমাও তাঁকে করতে হয়েছে কিনা।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত 'হিন্দু বিচ্ছিন্নতা' সন্ধানী বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য করে সহজেই একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া যায় এই বলে যে তাঁরা এদেশের দশজন প্রগতিশীল মুসলমান বুদ্ধিজীবীকে খুঁজে বের করুন যাঁরা প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলবেন যে হিন্দু পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করতে মুসলমান যুবকের যেমন বাধা নেই, তেমনি মুসলমান মেয়েদের পক্ষেও হিন্দু যুবককে, ধর্মপরিবর্তনের শর্ত না রেখেই, বিবাহ করার বিষয়ে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিংবা এমন পাঁচজন প্রগতিশীল মুসলমান বুদ্ধিজীবীকে খুঁজে বের করুন যাঁরা বলবেন সকল ধর্মের সকল মানুষই সমান এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা এমন বিবৃতি দিতে সাহসী হবেন খুব কম সংখ্যক মুসলমান বুদ্ধিজীবী। কারণ ধর্মেই রয়েছে নিষেধের চোখ রাঙানী। 'কোরান শরীফ' - এর আয়াতেই বলা হচ্ছে ঃ-"অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের কন্যার বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা - বাকারাহ্, রুকূ - ২৭, আয়াত - ২২১)

কাজেই হিন্দু -মুসলমান মিলনের বাধা কোথায় তা জানার জন্য বহু গবেষণার কষ্টস্বীকার বৃথা। বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন আধুনিক শর্মিলা ঠাকুরকে আয়েষা বেগম হতে হয় পতৌদির নবাব মনসূর আলি খানকে বিয়ে করবার জন্য, কেন অতি আধুনিক সুমন চট্টোপাধ্যায় হয়ে যান কবীর সুমন।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস, এরাই দূরদর্শনে-সভায়-সমাবেশে আমাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে ভূরি ভূরি জ্ঞান বিতরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন ঃ- "তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার জন্য অন্য কোন উপায় নেই।" — তখন সেই সত্যটি অপ্রিয় বলে আমাদের মন তা অস্বীকার করতে চায় ঠিকই, কিন্তু তাতে সত্যের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় কি ?

এমন যদি মেনে নেওয়া যায় যে সবাই মিলে রাতারাতি পরিবর্তন করলেন ধর্ম। একটি নির্দিষ্ট রঙই না হয় লাগলো আধুনিক জীবনের এক অংশে। কিন্তু সমাজ?

আমাদের প্রত্যেক দিনের গুটি গুটি চলার পথে যে সমাজ আলোর দিকে একটু একটু করে এগিয়ে গেছে তাকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে?

সমগ্র পৃথিবীর যেখানেই ইসলাম তার সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করেছে, সেখানেই সমাজ কোন চেহারায় এসে সামনে দাঁড়িয়েছে তা আমরা দেখছি না? পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম। ঘরের কাছে প্রতিবেশী বাংলাদেশে কি চলছে? মেয়েদেরকে 'বোরখা'র আড়ালে লুকোবার ফতোয়া দিয়ে যা শুরু হলো তার শেষ কোথায় কে জানে?

ভারতবর্ষেও স্মরণাতীত কাল থেকে বিদেশীরা এসেছেন কিন্তু মুসলমানরা এদেশে আসার ফলে যে রক্তপাত ঘটেছে তেমন উদাহরণ একান্তই নগণ্য। শুধুমাত্র অভিযোগকারী নেতার মনোভাবই রক্তপাতের কারণ, এর পিছনে কোনো বিশেষ দার্শনিক চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল না ---- এ নিতান্তই সরলীকৃত ব্যাখ্যা।

নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি তাদের অভিধানে একান্তই অচল ---- এই সত্য কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? তথাকথিত বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়েও 'যত মত তত পথ' - এর নীতিতে আস্থা স্থাপন যা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ছাড়া আর কি? মুসলমান কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী তো দূরের কথা, সামাজিক কোনো গোষ্ঠীকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যারা বলবেন 'যত মত তত পথ' যথার্থই মানবিক ভাবনার প্রতিফলন।

হিন্দু সমাজ পিছিয়ে নেই এমন নয়। কিন্তু এরই মধ্যে যারা এগোতে চাইছেন তারা কেন আবার 'পিছনমুখী' চলার সম্ভাবনাকে জিইয়ে তুলবেন?

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ব্যাখ্যায় যারা যথার্থ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে জলের উপর তল দেখেই গভীরতা মাপতে চান, তারা তা করেন নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। একে দুষ্টবুদ্ধি বলা যাবে না কেন? এদেরই সাথে যুক্ত হন অপরিণামদর্শী কিছু বুদ্ধিজীবী। বহু বিষয়ে জাতির শিক্ষক হয়েও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনায় যুক্তি ও তথ্যে আস্থা রাখার পরিবর্তে আবেগে ভেসে যেতে অভ্যস্ত এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে

গিরগিটির মতো রঙ বদলান তা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান আলোচনা এদের স্বরূপ সন্ধানেরই এক প্রচেষ্টা — প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার রোজনাম্‌চা।

সাদাকে সাদা অথবা কালোকে যথার্থই কালো আখ্যাত করে সত্যভাষণে খ্যাতিমান হবার পথ সকলের জন্য প্রশস্ত নয়। সে ক্ষেত্রে খ্যাতকীর্তি না হয়েও খ্যাতিমান হবার জন্য সাদাকে কালো অথবা কালোকে সাদা বলে আসর জমিয়ে তোলার চেষ্টা সাম্প্রতিক কালের একটি জনপ্রিয় পন্থা। ঔচিত্যবোধের নিরিখে প্রকৃষ্ট পন্থা কিনা সে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। অধিকন্তু বিষয়টি যদি হিন্দু-মুসলমান — এই দুই সম্প্রদায়ের পাস্পরিক সম্পর্কবিষয়ক হয় তাহলে তো 'সোনায় সোহাগা'। যে কোন আলোচনার শেষে যদি ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরু হিন্দু-সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় টেনে আনা যায় ;তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মেরে প্রগতিশীল হিসেবে জাতে ওঠা তো যায়ই, নানা মহলের দাক্ষিণ্যের কলাটা-মুলোটা নগদ লাভের সম্ভাবনাও প্রবলতর করে তোলার সুযোগ তৈরী হয়।

সাম্প্রতিককালে উপরোক্ত প্রবণতা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে নিতান্ত অপ্রয়োজনেও 'ধান ভানতে শিবের গীত' গেয়ে যে কোন বিষয়ে হিন্দুকে শুধুমাত্র হিন্দু হবার কারণে গালমন্দ করা যেন প্রায় ছোঁয়াচে রোগের আকার ধারণ করেছে। নিন্দিত হিন্দুত্ববাদীরা নন, অন্যরাও এই দুষ্টুবুদ্ধি ধরতে পারছেন, কেউ কেউ চিহ্নিতও করছেন তাকে। কপটাচার ও অপরিণামদর্শীতার মাঝে তা অবশ্যই কিছু পরিমানে স্বস্তির মুক্ত বাতাস বহন করে আনছে।

জনৈক বিকাশ চক্রবর্তী বাংলার বাউলদের নিয়ে 'বাউলজীবনের সমাজতত্ত্ব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন সম্প্রতি। লেখকের বাউলচর্চা কতখানি মৌলিক সে প্রশ্নে না গিয়েও গ্রন্থটির ৬নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। লেখক মন্তব্য করেছেনঃ- "অতি সাম্প্রতিকালের ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে বাউল-ফকিররা হিন্দু অথবা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা এখনও অত্যাচারিত হয়ে থাকেন।"

গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, ১৭ই অক্টোবর ২০০৪ -এর 'দেশ' পত্রিকায়।

সুধীর চক্রবর্তী বাংলার বাউল সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক. বাংলার গৌনধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়ে একজন স্বীকৃত ও খ্যাতকীর্তি গবেষক এবং অবশ্যই হিন্দুত্ববাদী নন। (কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিষয়ে সুধীরবাবুর গবেষণা অবশ্য বহু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে হিন্দুত্ববাদী দ্বিজেন্দ্রলালকে মহৎ বানানোর এক প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত।)

সুধীরবাবু বিকাশ চক্রবর্তীর উপরোক্ত মন্তব্যের প্রসঙ্গে এনে লিখেছেন ঃ- "সর্বশেষে একটি তথ্যভ্রান্তির ব্যাপারে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ......... যতদূর জানা যায়, বাউল-ফকিরদের ওপর গত কয়েক দশকের অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে মৌলবাদী মুসলমানদের দ্বারাই — হিন্দুরা কেন তাঁদের ওপর অত্যাচার করবে।"

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বাউলজীবনের সমাজতত্ত্ব রচনায় লেখক যে তথ্যভ্রান্তি ঘটালেন তার পেছনে লেখকের কোন মনস্তত্ত্ব কাজ করছে?

সুধীরবাবু, বিকাশ চক্রবর্তীর লেখায় যে তথ্যভ্রান্তি সকলের নজরে আনলেন, সে ধরনের তথ্যপ্রমাদ আজকাল বহু গ্রন্থেই প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে 'ধ্রুব' স্থান দখল করে নিচ্ছে।

মুসলমানসমাজের এমনকী মৌলবাদী অংশকেও তাদের কোন কাজের জন্য সত্যের খাতিরে নিন্দিত করতে হলেও নিতান্তই অকারণে তার সাথে হিন্দুদেরকে জুড়ে দিয়ে স্বকপোলকল্পিত ভারসাম্য ঘটানোর প্রচেষ্টা যে বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তাতে আর সন্দেহ কি?

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ যে কতটা বাস্তবসম্মত তা বোঝা যায় অতি সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনার মাধ্যমে।

ঘটনাটি এই পশ্চিমবঙ্গেরই বীরভূম জেলায় অবস্থিত কোটা গ্রামের। যে সুফী-দরবেশদের মাধ্যমে আমরা ইসলামের মুক্তমনের সন্ধান করি, সেই সুফি-ফকিরি গান গাইতে গিয়ে মুসলমানপ্রধান গ্রামে গ্রামবাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন ১৭ বছরের সানোয়ার।

সানোয়ারের দাদা, এই অজুহাতে হত্যা করা হয়েছে নূর হোসেন (৩০), নূর আলি (২৬), আবুল হোসেন (২৪), জিয়ার হোসেন (২১), আনোয়ার হোসেন (১৯) - কে। হত্যা করা হয়েছে তাঁদের মাসির ছেলে জাফর শেখ (২৫), পিয়ার শেখ (২৪) এবং ভুনু শেখকেও (২১)।

মাড়গ্রামের সানোয়ার কোটায় তাঁর বোন নাইমার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন।

গত ৬ই আগষ্ট, ২০০৫ - এর আনন্দবাজার পত্রিকায় নাইমা বিবির জবানিতে ঘটনাটি এ রকম ঃ-"ছোটদাদা সানোয়ার মাড়গ্রাম থেকে আমার বাড়িতে এসে ফকিরি গান গাইছিল। পড়শিরা শুনতে জড়ো হয়েছিলেন। গানে 'প্রভু' উচ্চারণ করায় গ্রামের দুই যুবক দাদাকে চড় কষায়। বলে, এখানে 'প্রভু' উচ্চারণ করতে পারবি না।"

সানোয়ার পরের দিন ফকিরি গানের উদার ধর্মভাব বোঝানোর জন্য তাঁর দাদাদের নিয়ে গ্রামে একটি গানের আসর বসানোর ব্যবস্থা করেন। বোন নাইমার বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পরে বিশ্রাম করার সময় শ'চারেক মুসলমান গ্রামবাসী বল্লম, টাঙ্গি, তলেয়ার নিয়ে আক্রমণ চালায়। খড়ের চালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাধ্য করে সানোয়ার ও তাঁর ভাইদের বাইরে বেরিয়ে আসতে। উন্মত্ত জনতা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয়জনকেই কুপিয়ে হত্যা করে পাশের মাঠে ছড়িয়ে দেয়।

সানোয়ারের মা আনোয়ারা বিবিও সেদিন মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। চোখের সামনে ছেলেদের খুন হতে দেখেছেন তিনি। লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও বিচার মেলেনি। 'কেস ডাইরী' হারিয়ে গিয়েছে বলে হাইকোর্টে জানিয়েছেন সরকারী কৌঁসুলি।

সুফিবাদে বিশ্বাসী আইনজীবী সৈয়দ মুন্না, আনোয়ারা বিবির হয়ে মামলা লড়ছেন।

মামলার ফল কি হবে তা অজানা। কিন্তু যে উদার-মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমাদের গর্ব তার ভিতরের চিত্রটি কি বিকাশ চক্রবর্তীর মতো লেখকদের মনগড়া ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ করে না? সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত নিরপেক্ষতার স্বরূপ সম্বন্ধেও প্রশ্ন চিহ্ন আঁকা হয়ে যায় না কি?

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু এই সংঘাতের বিচারকালে কোনো একটি সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র কনিষ্ঠ পক্ষ হবার জন্য বিশেষ প্রীতি প্রদর্শনে যদি সততই তার অপরাধমাত্রাকে খাটো করে জ্যেষ্ঠকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে জ্যেষ্ঠ বহুদিন সেই শাসন শিরোধার্য করে চলবে এমন ভাবনা সমীচীন হতে পারেনা। কনিষ্ঠের অপরাধে জ্যেষ্ঠকেও জেলের ঘানি

টানতে হবে এ আবদার কতদিন সহ্য করা যাবে?

তথাকথিত নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা একথা বোঝেন না এমন নয়, কিন্তু এ বিষয়ে হক কথায় পাছে নানা রঙিন সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যায়, সেই কারণে বিপরীতমুখী হাঁটতেও দ্বিধা করেন না। এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা যে তাদের সামনে ধরা দর্পণে বৃহন্নলার রূপেই উদ্ভাসিত হবেন বিশিষ্ট পণ্ডিত তথা গবেষক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার তা যথার্থই উপলব্ধি করেছেন।

গোধরাতে করসেবকদেরকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার পর মুসলমানদের তরফে ঘটনার নিন্দা করা হলে গোধরা পরবর্তী গুজরাট দাঙ্গা সম্ভবত ততটা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে না।

গত ২২শে মার্চ, ২০০৬ এ আনন্দবাজার পত্রিকায় গৌতম রায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বারানসীর সংকটমোচন মন্দিরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় বেশ কিছু হিন্দুর মৃত্যু সত্বেও হিন্দুদের সহনশীলতার যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তা উপরোক্ত ধারণারই সত্যতা প্রমাণ করে।

সঙ্কটমোচন মন্দিরের হত্যাকাণ্ডের পর মুসলমান ইমাম, উলেমারা যেভাবে তার নিন্দা করেছেন তা প্রশংসনীয়। যদিও একথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে যে মুসলমানদের কিন্তু অতীতে কখনো এধরনের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করতে দেখা যায় নি —না কাশ্মীরে, না দেশের অন্য কোনো স্থানে।

গোধরাকাণ্ডের পরবর্তী দাঙ্গা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব' ব্যঙ্গ বিদ্রুপের খোরাক হয়ে উঠেছে। গুজরাটের দাঙ্গাকে মহান করে তোলার কোনো প্রশ্নই আসেনা, কিন্তু একথা ভেবে দেখা প্রয়োজন যে সংকটমোচন মন্দিরের ঘটনায় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া গোধরাপরবর্তী গুরজরাট দাঙ্গায় হিন্দুদের সহিষ্ণুতার বাধ ভেঙ্গে যাবার ঘটনারই প্রতিফলন কি না? অবশ্য যদি একান্তই তা হয় তাহলে এটি একটি শুভলক্ষণ। যে কোনো হঠকারী কাজের যে এখটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া হবে এই বাস্তব বোধ থাকাটাও তো একটি সদর্থক ভাবনা।

গুজরাটের গোধরাতে করসেবকদের পুড়িয়ে মারা হলো। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় যে বিভিন্ন স্টেশনে করসেবকদের দুর্ব্যবহার এবং মুসলমান মহিলাদের প্রতি কটুক্তিবর্ষণে ক্ষিপ্ত মানুষ করসেবকদের আক্রমণ করেছে, তাহলেও নারী- শিশু নির্বিশেষে এতগুলি মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করা একান্তই নিন্দার্হ নয়?

(এখানে লালন ফকিরের সেই বিখ্যাত গান 'বামন চিনি পৈতাতে, বামনি চিনি ক্যামনে'র অনুকরণে 'মুসলমান চিনি দাড়ির নূরে, মুসলমানী চিনি ক্যামনে' বলা যায় কি!)

কিমাশ্চর্যম, এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গোধরা হত্যাকাণ্ডকে লঘু করতে প্রথমে উপরোক্ত যুক্তি খাঁড়া করেছিলেন। কিন্তু ধোপে না টেকায় বললেন নরেন্দ্র মোদীর সরকার ষড়যন্ত্র করে করসেবকদের পুড়িয়ে মেরেছেন এবং তারই অজুহাতে দাঙ্গা বাঁধিয়ে নির্বাচনে জয়লাভের পথ পাকা করেছেন।

কি ভয়ানক অভিযোগ! সামান্যতম দায়িত্ববোধ থাকলে এমন কথা বলার আগে নিশ্চিত প্রমাণ হাতে আসা প্রয়োজন ছিল না কি? এদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যেন নতুন এবং করসেবকদের হত্যার প্ররোচনা থাকা সত্ত্বেও গোধরাতে দাঙ্গা লাগা যেন একান্তই এক অসম্ভব ব্যাপার!

ইতিহাস সচেতনতার দাবি যারা করেন, তারা পুরানো নথিপত্র এবং তথ্য একেবারেই ঘেঁটে দেখবেন না — এ কেমন কথা? গোধরা বরাবরই একটি সংবেদনশীল স্থান। অতীতে বহুবার সেখানে দাঙ্গা হয়েছে। এবিষয়ে বহু তথ্য দিয়ে লেখাকে ভারাক্রান্ত করার বদলে উদাহরণ হিসেবে মনস্বী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আজ থেকে ৭৫বছর আগে, যখন নরেন্দ্র মোদীদের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কোন ষড়যন্ত্র ছিল না ; বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামজনমভূমি আন্দোলন ছিলনা, তখনও গোধরায় দাঙ্গা হয়েছে।

প্রবাসী 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' এই শিরোনামে লিখছে (পৃ ১৭৪) ঃ- "......... গোধরায় জৈনদের এক শোভাযাত্রা মসজিদের সম্মুখ অতিক্রম করার সময় মুসলমানগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তার ফলে একজন নারী আহত হয়। উক্ত শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইলে মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে আরও একটি হাঙ্গামা হয় তাহাতেও ১২জন লোক আহত হইয়াছে।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ ডাব্লিউ.এস.মুকাদাম, মস্তকে এবং বাহুতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ১৩জন আহত ব্যক্তির মধ্যে ১২জনই হিন্দু। যে মুসলমানটি আহত হইয়াছে তিনি একজন পুলিশ পেট্রল। গোধরা হিন্দু মহাসভার স্ট্যাণ্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং প্রসিদ্ধ

উকিল মিঃ পুরুষোত্তম একজন মুসলমান তৈল ব্যবসায়ীর দ্বারা গুরুতর রূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।"

করসেবকদের জীবন্ত দগ্ধ করার প্ররোচনায় গোধরায় দাঙ্গা বেঁধে ওঠাকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করবার সময় ভাবলেন না এদের মন্তব্যের পরিণাম কি হতে পারে!

গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হলো। নানা রোমহর্ষক কাহিনী সংযোজিত হলো তাতে। দু-চারটি তেমন ঘটনা সত্য নয় — এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশই যে নেহাত বানানো গল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গত ২৬শে এপ্রিল, ২০০৩ - এর আনন্দবাজার পত্রিকায় অলোককুমার ঘোষ বেশ কয়েকটি ঐ জাতীয় গ্রন্থের পর্যালোচনা (সমালোচনা, ইংরেজী Review-এর সার্থক প্রতিশব্দ নয়।) করেছেন। ঐ তালিকায় অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় ও সোমা মারিক সম্পদিত 'গর্ভঘাতী গুজরাট'(তৃতীয়-শ্রেণীর যাত্রাপালার নামকরণও হার মেনে যায়!) গ্রন্থটি ছিল। পর্যালোচক এই বই-এ বর্ণিত ঘটনা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা তুলে দেওয়া যাক :- "............... কী করে বিশ্বাসযোগ্য হবে সেই বর্ণনা যেখানে ধর্ষণের শেষে সুলতানি পিরোজের পা কেটে রেখে যায় দুস্কৃতীরা, অথচ একটু পরেই পিরোজা বাচ্চা কোলে নিয়ে নদী বরাবর দৌড়ে পালিয়ে যায়!" (গর্ভঘাতী গুজরাট, পৃ - ৯৮)

'গল্পের গরু গাছে চড়ে' একথা সমালোচক জানেন না এমন নয়, কিন্তু পাখা মেলে উড়তেও পারে তা জানা সম্ভব কজনার!

গুজরাট নিয়ে লেখা সমস্ত লেখায় প্রশাসন ও পুলিশকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা নাকি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অবাধে লুঠ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সংঘটিত করেছে।

গত ২১শে অক্টোবর, ২০০৩ - এর আনন্দবাজার পত্রিকায় পি.টি.আই-এর সরবরাহ করা একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'গুজরাট পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা' শিরোনামের সেই সংবাদটি এই রকম :- "গুজরাটের দাঙ্গায় আক্রান্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই রাজ্যের পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করলেন। নানাবতী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে তাঁরা জানিয়েছেন, পুলিশের জন্যই তাঁরা বেঁচে গিয়েছেন।

সাক্ষ্যে বেরামপুরের বাসিন্দা মুমতাজ পাঠান জানিয়েছেন, দাঙ্গাবাজরা তাঁদের মেরেই ফেলত, কিন্তু পুলিশ ঠিক সময়ে আসায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।

..........দাঙ্গায় আক্রান্ত হাজি মহম্মদ পটেলও পুলিশের প্রশংসা করে বলেন, দাঙ্গাবাজরা ইব্রাহিম সৈয়দ দরগা আক্রমণ করলে পুলিশ দাঙ্গাকারীদের হটিয়ে দেয়।"

তাহলে প্রশাসন ও পুলিশ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘুদের মনে সন্দেহ ও আস্থাহীনতার বীজ বপন করছে কারা?

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২, ডাউন সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনটি আক্রান্ত হয় গোধরা রেলস্টেশন থেকে ৫০০ মিটার দূরে, ২৫জন মহিলা ও ১৪জন শিশু সহ মোট ৫৭জন মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করা হলো। পরিণামে সমগ্র গুজরাট জুড়ে দাঙ্গা বেঁধে যায়।

'গুজরাট নরমেধ যজ্ঞ' নামে গ্রন্থটির সম্পাদক রুদ্রদেব মিত্র জানিয়েছেন ২০০১সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নাকি গুজরাট দাঙ্গার ছক সাজানো হয়েছিল এবং তিনি তখনই তা জানতে পেরেছিলেন। (পৃ-১০)

পাঁচ মাসেরও বেশী সময় পেয়েছিলেন রুদ্রদেব দাঙ্গার ষড়যন্ত্র জানার পর। না, কোথাও ঘুণাক্ষরেও তিনি তা প্রকাশ করেননি!

রুদ্রদেবের মতো সম্প্রীতিবাদী মানুষ গুজরাট দাঙ্গার আগাম সংবাদ জেনেও সেটি প্রকাশ করবেন না, তা বিশ্বাস করতে, কষ্ট হয়! অবশ্য ষড়যন্ত্রের কথা বলতে রুদ্রদেব যদি করসেবকদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনার কথা বলতে চান, তাহলে রুদ্রদেবের পক্ষে সেটি প্রকাশ না করাটাই স্বাভাবিক এবং তা বরং অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। বিশেষত, কাক পাখী স্বজাতির মাংস না খেলেও, হিন্দু তা খায় না এমন কথা যখন অন্তত জানা নেই।

রুদ্রদেব অবশ্য অন্তত একটি বিষয়ে গঠনমূলক প্রস্তাব রেখেছেন ---- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মরণে একটি জাতীয় মনুমেন্ট গড়ার কথা বলার মধ্যে দিয়ে। (গুজরাট নরমেধ যজ্ঞ, পৃ-১২)

বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা অরুন্ধতি রায় ইদানিং গল্প-উপন্যাস লেখার চাইতেও সংবাদপত্রে প্রতিবেদন লেখাতেই বেশী উৎসাহী। গুজরাট দাঙ্গা তাঁকে এবিষয়ে বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। কাহিনী উপস্থাপনায় যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন শ্রীমতী রায়ের তা একান্তই সহজাত বলে গুজরাট নিয়ে প্রতিবেদন রচনায় তিনি তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যথার্থই উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্না লেখিকা হিসেবে নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তবে গল্প হিসেবে অরুন্ধতী রায়ের

লেখা আকর্ষণীয় হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

২০০২ - এর ৫ই এপ্রিল 'Out Look' পত্রিকায় অরুন্ধতী গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে যে নিবন্ধ রচনা (যথার্থই রচনা) করেন তার সূচনা এই রকম ঃ- "বরোদা থেকে এক বান্ধবীর ফোন এলো। ফোনে সে অঝোরে কাঁদছে। ওর এক বান্ধবী সঈদা উন্মত্ত জনতার হাতে পড়ে গিয়েছিল। সঈদার পেটটা চিরে দাঙ্গাকারীরা জ্বলন্ত কাপড়ের ফালি ঢুকিয়ে দেয়। সঈদা মরে যাবার পর তার কপালে লিখে দেয় ওম।"

দাঙ্গায় সঈদা কিংবা সীতা নামের কোন যুবতীর নিহত হবার ঘটনা মোটেও অসম্ভব নয়। দাঙ্গাকারীরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ——এমন ঘটনাও সত্য হতেই পারে। কিন্তু ভাবুন দেখি কপালে 'ওম' লিখে দেবার বিষয়টি। দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে তাহলে এক শিল্পীও ছিলেন যিনি দাঙ্গার উন্মত্ততা ও গণ্ডগোলের মাঝেও নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে তার শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠবে না কে দেখেছেন সঈদার কপালে আঁকা সেই অভূতপূর্ব শিল্পকর্ম? যদি দেখে থাকেন তাহলে ছবি তুলে রেখেছিলেন কি শিল্পকর্মের?

প্রশ্ন উঠতে পারে অরুন্ধতী রায়ের মত সম্মনীয়া লেখিকা মিথ্যে লিখবেন একথা বিশ্বাসযোগ্য?

হ্যাঁ অরুন্ধতী রায় অনেক স্থানেই সত্য বলেননি। ঐ নিবন্ধেরই আর একটি বর্ণনা ঃ- "হিংস্র জনতা তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাঁর কন্যাদের নগ্ন করে পুড়িয়ে মারে। তারপর জাফরীর মাথা কাটে এবং টুকরো টুকরো করে তাঁকে।"

এহসান জাফরীর পুত্র টি.এ.জাফরী ২রা মে'র 'ASIAN AGE' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ঃ- "আমার ভাই-বোনদের মধ্যে আমি একাই ভারতে বাস করি। ভাই-বোনদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড় এবং আমার ভাই ও বোন আমেরিকায় বাস করেন।"

জাফরী একথাও জনিয়েছেন যে তাঁর বোন সুস্থ আছেন।

তাহলে অরুন্ধতী রায় জাফরীর কন্যাদের (বহুবচন করে ভারী করা হয়েছে।) নগ্ন করে পুড়িয়ে মারার গল্প ফাঁদলেন কি উদ্দেশ্যে?

সঙ্গীত সাধক ফৈয়াজ খাঁর সমাধি নষ্ট করার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন অরুন্ধতী রায় তাঁর লেখায়। কলকাতায় এই সংবাদ শুনে প্রকৃত ঘটনা কি তা

বিচার না করেই বিবৃতি দিলেন কিছু শিল্পী। সরকারী প্রসাদপ্রার্থী বুদ্ধিজীবীরা তো আছেনই, এমনকী সংযতবাক এবং প্রচারে বিখ্যাত হতে হয়নি এমন কিছু যথার্থ গুণী শিল্পীও প্রতিবাদ করলেন তথাকথিত গৈরিকবাহিনীকে দোষারোপ করে।

ফৈয়াজ খাঁর সমাধি বরোদার দর্শনীয় স্থান ছিল কি?

বিশিষ্ট লেখক নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন ঃ- "সমাধিটি কি অবস্থায় ছিল? ১৯৫৮-তে মৃত ওস্তাদ, তাঁর কবর দেখতে গিয়েছিলেন কুমারপ্রসাদ মুখোপাধায়, মৃত্যুর চোদ্দ -পনের পছর পরে। বরোদায় গিয়ে তিনি দেখলেন, ওস্তাদের মজ্‌হর কোথায় সেটা জানা দূরের কথা, ওস্তাদ কে তাই কেউ জানেনা। খুঁজতে খুঁজতে তিনি শহরের অনেক গলি ঘুঁজি পেরিয়ে, একটি ছোট মোটর গ্যারাজের পিছনের দরজা দিয়ে, একটা কাঠা দশেক খোলা জায়গা, একাধিক নাম না জানা কবরের মধ্যে দেখতে পান, কোণে ছতরীওয়ালা কবর ওস্তাদের। প্রশ্ন জাগে, এমন একটি চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা কবরের উপর আক্রোশ হবে কার? যেখানে ওস্তাদকেই লোকে ভুলে গেছে। মহাশ্বেতা দেবী যখন কবর ধ্বংশের খবর পেয়ে ধিক্কার জানান, তখন নিশ্চয়ই কবর ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সেটা কি ওস্তাদকেই অসম্মান করার জন্য? যাঁর গানে রাধাকৃষ্ণের ছড়াছড়ি, যিনি সঙ্গীত শুনে 'রাধে রাধে' বলে তারিফ জানাতেন, যিনি ধ্রুপদ গাইতেন 'ওম অনন্ত নারায়ণ হরি' দিয়ে, যাঁর 'বন্দে নন্দকুমারম' ঠুংরি বিখ্যাত, তাঁর উপর গৈরিকবাহিনীর আক্রোশ কেন? কবরখানায় আক্রমণ বিশেষ করে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁকেই অসম্মান, না অন্ধভাবে কবর ধ্বংস, না জমির ধান্দায় এই আক্রমণ?................ফৈয়াজ খাঁকেই অপমান করা হয়েছে, এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে?"

শ্রীযুক্ত নিত্যপ্রিয় ঘোষ আরও বেশ কয়েকটি বিষয় তাঁর লেখাতে এনেছেন। কোনো কোনো স্থানে মিথ্যা এবং ভুল সংবাদের উপর ভিত্তি করে কি ভাবে 'হিন্দু সম্প্রদায়িকতা'-র কথা বলে মুসলমানদের উত্তেজিত করে চলেছেন এদেশের তথাকথিত সমাজমনস্ক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকরা, শ্রী ঘোষের লেখা সে বিষয়েও আলোকপাত।

শ্রী ঘোষ লিখছেন ঃ- "২৩শে এপ্রিল লোকসভায় তুমুল আলোড়ন, গুজরাট শিক্ষা ব্যবস্থায় গৈরিকীকরণ। উপলক্ষ গুজরাট রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষায় ইংরেজি প্রশ্নপত্রে কয়েকটি বাক্য, যার উদ্দেশ্য নাৎসীদের জয়গান করা, নাৎসি আদর্শ

প্রচার করা। পরের দিন যথারীতি সম্পাদকীয় লেখা হয় বড় বড় সংবাদপত্রে গৈরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে। অথচ লোকসভাতেই জানানো হয়েছিল, বাক্যগুলি নেওয়া হয়েছে অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক থেকেই। বাক্যগুলোর রচয়িতা ই.এম.ফর্স্টার যাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাৎসিদের ব্যঙ্গ করা। যাঁরা Irony বুঝতে পারেন না, তাঁদের আলোকিত করা কোন ব্যবস্থায় সম্ভব? সাংসদরা হয়তো না জেনেই সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু জানার পরও সম্পাদকীয় লেখার কারণ।.........আরও পরিহাসের বিষয়,প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন, তিনি করেছিলেন গুজরাটের দাঙ্গার বছর খানেক আগে এবং তিনি একজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রী।"

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের মিথ্যাচারও ধরা পড়েছে গুজরাটের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। ১৮ই এপ্রিল, ২০০২-এ যে পরীক্ষা নেওয়া হলো, আইনশৃঙ্খলার কথা ভেবেই সেই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির কিছু কিছু শান্তিপূর্ণ এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন ঃ- "পরীক্ষাকেন্দ্রের স্থানান্তরের বিরুদ্ধে সভা করে অ্যাফেক্টেড সিটিজেন্স অফ আহমেদাবাদের নেতারা পরীক্ষা বয়কটের ডাক দিলেন। পরের দিন বোর্ড জানাল প্রথম দিন ৯২-৯৫শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু বহু কাগজে লেখা হলো ৯০শতাংশ মুসলমান ছাত্ররা বয়কট করেছে। .........ঐ অ্যাফেক্টেড সিটিজেন্স অফ আহমেদাবাদের মুখপাত্র বলেছেন, আহমেদাবাদের আটহাজার মুসলমান ছাত্রছাত্রীর ৩,৬০০ অনুপস্থিত। অর্থাৎ অনুপস্থিতির সংখ্যা ৪৫শতাংশ।"

স্বভাবতই দায়িত্বজ্ঞানহীন ঐ সব সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সংখ্যালঘু দরদী সাজবার জন্য একের পর এক মিথ্যা সংবাদ দিয়ে যান, সম্পাদকীয় লেখেন – এদের নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই।

সংবাদপত্রে কিভাবে মিথ্যা সংবাদ ছাপিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট করা হয় তার দৃষ্টান্ত সর্বত্র রয়েছে। বহুপূর্বে কলকাতায় হিন্দু -মুসলমান দাঙ্গা নিয়ে মিথ্যাচারের এক উদাহরণ রয়েছে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'যাত্রী' গ্রন্থে — "ত্রিশ-চল্লিশজন মুসলমান হিন্দুদের তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপ্‌কে লাফিয়ে পড়েছে আমাদের ভিতর বাড়ির বাগানে। দারোয়ানরা লাঠি হাতে দৌড়লো তাদের মারবার জন্যে। দারওয়ানদের ধমকে সরিয়ে দিয়ে আমি তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে বসালুম আমাদের একতলার বারাণ্ডায়। বাগানের পাঁচিলের ওদিকে

তখন ভীষণ হল্লা শুরু হয়েছে। গিয়ে দেখি প্রায় দু' তিনশো লোক জড়ো হয়েছে। আমাকে দেখে চিৎকার শুরু হোলো — মুসলমানদের বের করে দাও নইলে আমরা জোর করে বাড়িতে ঢুকব। হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকলে তাদের কি অবস্থা হবে। কিছুক্ষণ হট্টগোল করে তারা সব চলে গেল। আন্‌জুমানকে টেলিফোন করে গাড়ি আনিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিলুম। তার দুদিন বাদে 'হানিফী'তে বের হোলো যে ঠাকুরবাড়ির সৌম্যেন্দ্রনাথ অনেক মুসলমানকে বাড়িতে আটক করে ফেলেছিল, নেহাৎ খোদাতাল্লার কৃপা ছিল বলে এই মুসলমানেরা অনেক কৌশল করে তার হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে। 'হানিফী'র সম্পাদক আমাদের শ্রমিক-কৃষক দলের আফিসে মাঝে মাঝে আসতেন। পরে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলুম তাঁকে যে আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাঁর কাগজে সেই খবরটি কোথা থেকে জোগাড় হোলো! তিনি হেসে বললেন আন্‌জুমান খবর দিল আপনি অনেক ক'টি মুসলমানকে বাঁচিয়েছেন। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বলেও দিল যে খবরটিকে বিকৃত করে কাগজে বের করতে, তাই করেছি ব্যবসার খাতিরে।"

মহাশ্বেতা দেবী, অরুন্ধতী রায় থেকে আরম্ভ করে সকলেই গুজরাট দাঙ্গায় পুলিশের নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন। যে কোন দাঙ্গাতেই এই অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলি যাচাই না করেই সিদ্ধান্ত দেবেন!

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এদেশের বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করে যথার্থই লিখেছিলেন যে এদের ঃ- "বেদ, দেশী সম্বাদপত্র"।

এখনও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। যে দাঙ্গায় মোট মৃত্যুর সংখ্য প্রায় ৭০০, সেখানে পুলিশের গুলিতেই মৃতের সংখ্যা ১৭০ এবং এরা অধিকাংশই দাঙ্গায় যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। গুজরাট দাঙ্গায় স্বাভাবিক কারণেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বেশী নিহত হয়েছেন কিন্তু হিন্দুরাও নিহত হয়েছেন অনেকে এবং বালবাহুল্য মুসলমান দাঙ্গাকারীদের আক্রমণে। দাঙ্গা একতরফা হয়নি।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ এবিষয়ে লিখেছেন ঃ- "খবরের কাগজ পড়ে সেখানে যে হিন্দুরাও আছে দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে, সেটা বোঝা দুস্কর। মুসলমান শিবিরের আশ্রয়প্রার্থীদের অভিযোগ হিন্দুরা পাচ্ছে পনেরো হাজার টাকা আর মুসলমানরা পাচ্ছে এক থেকে দুইহাজার। একহাজার বা পনেরো হাজার কোনওটাই যথেষ্ট

নয়। তবে এই কথাতেই বোঝা যায়, দাঙ্গা কবলিত হয়েছে দুই সম্প্রদায়ই।"

এখানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক সালাম আজাদের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সালাম আজাদ লিখেছেন ঃ- "বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।..................দাঙ্গা হয় দুই পক্ষে। কিন্তু এখানে একপক্ষ নীরব থেকেছে। মার খেয়েছে, পালিয়ে বেড়িয়েছে, অপর পক্ষ মেরেছে। .............বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন প্রতিদিন ঘটছে।"

ভারতবর্ষে যেখানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশী, সেখানে দাঙ্গা হয়। যেমন বিহারে, গুজরাটে। মুসলমানপ্রধান স্থানে দাঙ্গা হয় না, নির্যাতন চলে, হত্যা চলে। কাশ্মীর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গুজরাট থেকে এক কুতুবুদ্দিন আনসারী অন্যত্র গিয়েছেন ;কাশ্মীরের লক্ষাধিক মানুষ দিল্লীর সন্নিহিত অঞ্চলে উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করছেন স্বাধীন ভারতে। কুতুবুদ্দিনের দুঃখে কাতর বুদ্ধিজীবীরা কেউই কোনদিন কাশ্মীরীদের জন্য সামান্যতম সমবেদনাও জানাননি।

কাজেই এইসব বুদ্ধিজীবীদের, রাখি বাঁধতে তৎপর নায়িকাদের দরদ যে সকল মানুষের জন্য নয়, মুসলমানদের জন্য এবং তা প্রগতিশীলতা জাহির করে সরকারী কৃপা লাভ নিশ্চিত করার জন্যই, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে কি?

ইদানিং অবশ্য কিছু সাংবাদিক এবং লেখক হর্ষ দত্ত'র মতো কেউ কেউ ভণ্ডামীকে চিহ্নিত করবার জন্য কলম ধরেছেন। ('দেশ' -২রা সেপ্টেম্বর, ২০০৩)

গুজরাট দাঙ্গা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্য মহাশ্বেতা দেবী, অভিনেতা দিলীপ রায়, আজকাল পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত প্রমুখ ঐ প্রদেশ থেকে ঘুরে এসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখেছেন। দিলীপ রায় 'আজকাল' পত্রিকায় গত ২৩.৫.২০০২ তারিখে 'জবাব কি হবে মহাত্মাজী' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লেখেন। এই লেখায় আহমেদাবাদ থেকে বরোদা যাত্রাপথের একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে গাড়িতে করে লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা যচ্ছিলেন তার চালক ছিলেন জনৈক হিন্দু। পথে একস্থানে ধূমপানের প্রয়োজনে দেশলাই কিনবার জন্য গাড়ি থামাতে বললে চালক সেই স্থানে গাড়ি থামাতে অস্বীকার করেন কারণ চালক দলপতের ভাষায়, "উন সবকো মহল্লা

হ্যায় ইয়ে" অর্থাৎ মুসলমানদের এলাকা।

শেষপর্যন্ত অবশ্য লেখক ও তাঁর সঙ্গীদের কথায় গাড়ি থামাতে বাধ্য হন দলপত। দিলীপবাবু লিখেছেন ঃ- "...........বেচারি দলপতের হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাওয়ার অবস্থা।"

গাড়ি ঐ স্থান থেকে রওনা হবার পর দিলীপবাবুর ভাষায় ঃ- "..........দলপত যেন যমের দুয়ার থেকে ফেরে।"

মনে প্রশ্ন জাগছে না কি যে প্রায় সব তথাকথিত নিরপেক্ষ লেখকেরা যখন গুজরাটের দাঙ্গাকে 'দাঙ্গা' না বলে 'হিন্দুদের দ্বারা সংঘটিত মুসলমান হত্যা' বলে চালাতে চাইছেন তখন মুসলমান মহল্লায় হিন্দু 'দলপতের হাড়ে কাঁপুনি' ধরে কেন?

উপরোক্ত প্রতিনিধি দলের অপর সদস্য অশোক দাশগুপ্ত 'গুজরাট - যতটুকু বুঝেছি' শীর্ষক একটি রচনা লিখেছেন 'অনীক' পত্রিকায়।

দিলীপ রায় বর্ণিত ঘটনাটি অশোকবাবুর লেখাতেও স্থান পেয়েছে। অশোকবাবু লিখছেন ঃ- "দেশলাই কেনার ছুতোয় নামলাম, ..........দেশলাইয়ের দাম নিতেও হাত কাঁপছে দোকানির। গাড়ির চালক দলপত সিং বললেন, এরকম গাড়ি তো এখানে গত কয়েকদিনে অনেকবার থেমেছে এবং গাড়ি থেকে নেমেছে গুণ্ডারা। আগুন, হত্যা। তাই চোখেমুখে আতঙ্ক।"

বলাবাহুল্য,অশোবাবুর বর্ণিত দোকানি এবং আতঙ্কিত মানুষ মুসলমান মহল্লায় বসবাসকারী মুসলমান জনসাধারণ।

দুজন লেখকের রচনার কোনটি অবস্থার সঠিক চিত্র?

দিলীপ রায়ের বর্ণনায় গাড়ির চালক হিন্দু দলপতের কাঁপুনি, না অশোক দাশগুপ্তের লেখায় যেমন বলা হয়েছে মুসলমান দোকানির কাঁপুনি?

দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চিতভাবে যথার্থ ছবি তুলে ধরেননি। মুসলমান মহল্লা এবং মুসলমান দোকানি দোকান খোলা রাখতে সাহস করেছেন, কাজেই দিলীপবাবুর বর্ণনাই সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অশোকবাবুর বর্ণনায় সত্যের প্রতিফলন ঘটেনি এবং দিলীপবাবুর বর্ণনাতেই প্রমাণ হচ্ছে যেখানে যে সম্প্রদায় শক্তিশালী সেখানে সেই সম্প্রদায়ের মানুষকে ভয় পাচ্ছেন সেই নির্দিষ্ট স্থানের সংখ্যালঘু মানুষ — এমনকি হিন্দু হলেও।

রফিক য্যাক্যরিয়্যা নিঃসন্দেহে একজন ভারতীয় মুসলমান। ভারতবর্ষকে

নিজের দেশ বলে মেনে নেবার ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মবিশ্বাস কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু 'Hindustan Times' পত্রিকায় ২০০২-এর ২৭শে মার্চ তারিখে তিনি কিভাবে লিখলেন ঃ- "আনুমানিক চল্লিশটি শহর এবং দু'শ গ্রাম থেকে মুসলমানদের সাফাই করা হয়েছে।"

যাকারিয়্যা সাহেব সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। যতদূর জানি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অন্তত একটি শহর অথবা গ্রামের নাম করতে পারেননি যেখান থেকে মুসলমানদের সাফাই করা হয়েছে।

শর্মিলা বসু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় গত ১৮.৩.২০০২ এ লিখেছেন 'হিন্দুত্বের নামে সংগঠিত হত্যা'। একস্থানে শর্মিলা লিখেছেন ঃ- "হিন্দুধর্মের নামে অসংখ্য মুসলমান নারীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে পৈশাচিকভাবে। তবে মানবাধিকার কর্মীরা ধর্ষিতাদের পক্ষে জবানবন্দী নিতে পারছেন না, কারণ ধর্ষণের পরে তাদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব অধিকাংশ মৃত।"

তবু রক্ষা, শর্মিলা লেখেননি সবাই মৃত, লিখেছেন 'অধিকাংশ মৃত।'

তাহলে শর্মিলা দেবীর কাছে এবং শর্মিলা দেবীর মতো গল্প লেখক হর্ষ মানদার -এর কাছে কেন জানতে চাওয়া হবে না অন্তত সামান্য কিছু অত্যাচারিতা মহিলাদের সাকিন-ঠিকানা?

একটি নাম অবশ্য সংবাদপত্রে উঠে এসেছে বিলকিস বেগম। তার প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

সমস্ত দাঙ্গায় মহিলাদের প্রতি অত্যাচারের কিছু ঘটনা ঘটে। কিন্তু কিভাবে বিশ্বাস করব হর্ষ মানদার-এর সেই বর্ণনা যেখানে অত্যাচারের ঘটনাকে আতঙ্ককর চলচ্চিত্র (Horror Film) - এর কায়দায় তুলে ধরে লেখা হয়েছে ঃ-"গর্ভবতী জননীর পেট চিরে বার করে এনেছিল গর্ভস্থ সন্তান। পরিপূর্ণ অবয়বের মানব শিশুকে। .................সেই ভূলুণ্ঠিতা জননীর ভাগ্য অবশ্যই সুপ্রসন্ন ছিল — কেননা চোখ বোজার পরেই ধারালো ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়েছিল সেই শিশুর কচি হৃদপিণ্ড। তাতেও শান্তি নেই, তলোয়ারের এক কোপে সেই শিশুকে দ্বিখণ্ডিত করতে ভোলেনি সশস্ত্র যুববাহিনী।"

কে সেই প্রত্যক্ষদর্শী? কে সেই ছবির মতো বর্ণনা ধরে রেখেছেন তার ক্যামেরায়? হর্ষ মানদারের মনের ক্যামেরা কি না, সেই কূট প্রশ্নে না গিয়ে আবারও ফিরে যাওয়া যাক হর্ষ মানদার-এর বর্ণনায়। তিনি লিখছেন ঃ-

"দলবদ্ধভাবে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লীবত্ব আর অপরিমেয় বিকৃতির সমস্ত জানোয়ারেরা। নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জীবন্মৃত মেয়েদের সামনে। তারপর মাতৃসমাকে ধর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে পুত্রের বয়েসী ত্রিশূলধারীকে, বাপের বয়েসী সংঘী কুকুরের মতো রমন করেছে কন্যাসমা কিশোরীকে। মধ্যবয়সিনীকে কিশোর, ফুটফুটে বালিকাকে প্রৌঢ় — পর্যায়ক্রমে চলেছে অবর্ণনীয় যৌন সন্ত্রাস।"

না, হর্ষ মানদার তার ইমানদারী প্রমাণ করবার জন্য ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতারা কোন শহরের, কোন গ্রামের, সে তথ্য দেবার কথা ভাবলেন না। কিন্তু বর্ণনা দিতে গিয়ে যেভাবে হিসেব কষে প্রৌঢ়কে কন্যাসমা বালিকার ধর্ষণকারী, বালককে মাতৃসমা মধ্যবয়সিনীর ধর্ষক হিসেবে সাজিয়েছেন তাতে মনে হয় এ বর্ণনা হর্ষ মানদার-এর মনের কোণে লুকিয়ে থাকা কোন মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

তাছাড়াও হর্ষ মানদারের লেখায় রয়েছে অনেকগুলি শূন্যস্থান। মহিলারা সবাই কিভাবে একই স্থানে জমায়েত হলেন, পুরুষরা সবাই মহিলাদের ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন, হর্ষ মানদার তার লেখার দ্বিতীয় পর্বে তা পূরণ করলেন না।

দু-চারজন অত্যাচারিতার নাম-ঠিকানা চাওয়ায় বলা হয়েছে সাক্ষীদের নাম প্রকাশ করলে হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা তাদের গুজরাটে থাকতে দিত না ; তাদের জীবন বিপন্ন হতো।

উত্তরে একথা কেন বলা যাবেনা যে, কুতুবুদ্দিন আনসারী — যিনি শুধুমাত্র করজোরে প্রাণভিক্ষা করে ভারত বিখ্যাত হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় পেয়েছেন, ধর্ষকদের নাম-ধাম বলে তার চাইতে অনেক মহৎ কাজ করে আরও কিছু মুসলনমান প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ অথবা ত্রিপুরার মতো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেতে পারতেন না কি?

বিলকিস বানু সাক্ষী দিয়েছেন। আদালতে মামলা চলছে। বিচারে নিশ্চিতভাবে দুস্কৃতিদের শাস্তি হবে। বিলকিসের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বারোজনকে। অন্তঃসত্তা ছিলেন একথা জানিয়ে ধর্ষণকারীদের কাছে আবেদন করায় নিজে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিলকিস।

বিলকিসের এই বক্তব্যই কি সমস্ত গুলিয়ে দিচ্ছে না? ধর্ষণকারীরা যখন

এতই বিবেচক ছিলেন তখন বিলকিসের পদ্ধতি গ্রহণ করে ধর্ষিতারা সকলেই রেহাই পাবার চেষ্টা করলেন না কেন?

বিলকিসের বক্তব্য কুতুবুদ্দিন আনসারীর কথাও মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

গুজরাট দাঙ্গার সময় কুতুবুদ্দিন আনসারী করজোড়ে দাঙ্গাকারীদের কাছে প্রাণভিক্ষা করেছিলেন। তার সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইদানিং সে ছবি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের প্রচারের অবশ্য সামগ্রি হয়ে উঠেছে।

শুধুমাত্র হাতজোড় করে যদি দাঙ্গাকারীদের কাছে প্রাণভিক্ষা পাওয়া যায় তাহলে যাদের কাছে এই প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা তারা সত্যিই দাঙ্গাকারী কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়াটি কি একেবারেই অযৌক্তিক?

কুতুবুদ্দিনের নিষ্কৃতি কি প্রমাণ করে না যে দাঙ্গাকারীরা পেশাদার খুনী নয়, কোন সুতীব্র ক্ষোভের কারণে দাঙ্গায় যুক্ত হয়ে পড়লেও করজোড়ে প্রাণভিক্ষার প্রার্থনায় সাড়া না দেবার মতো হিংস্রতা তাদের স্পর্শ করেনি। সেক্ষেত্রে করজোড়ে প্রার্থনা করায় যারা কুতুবুদ্দিনের প্রাণভিক্ষা দিলেন, শুধুমাত্র সংবাদপত্রে ছবি প্রকাশিত হয়েছে বলে তারা কুতুবুদ্দিনকে ভয় দেখাচ্ছিল এবং সেই কারণেই কুতুবুদ্দিনকে গুজরাট ছাড়তে হলো —এসমস্তই নানা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে।

কুতুবুদ্দিনের ছবির সাংস্থানিক বিন্যাস কিংবা ইংরেজীতে যাকে Visualisation বলা হয়, তা বিশ্লেষণ করলেও কেমন যেন সন্দেহ জেগে ওঠে।

ছবিটি যেভাবে সামনাসামনি তোলা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে কুতুবুদ্দিনের বর্ণিত দাঙ্গাকারীরা যেন তার ছবি তুলতে দেবার জন্যই স্বেচ্ছায় দু-পাশে সরে দাঁড়িয়েছে এবং সেই কারণেই সামান্যতম বাধাও (obstruction) নেই ক্যামেরাম্যানের।

সব মিলিয়ে কুতুবুদ্দিনের ছবিও তাই যেন 'মোনালিসা'র হাসির মতই রহস্যময়।

গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে যে সমস্ত প্রচার ও গল্প — সেগুলির সংযোজনে আর এক 'আবোল তাবোল' তৈরী হওয়া সম্ভব।

মহাশ্বেতা দেবীও গুজরাট নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। নানা শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে লেখা সেই সব নিবন্ধ। মহাশ্বেতা দেবী নিজেই বলেছেন ঃ-"আমি দেখেছি যত, শুনেছি তার চেয়ে বেশী।" কাজেই মহাশ্বেতা দেবী যা নিজে দেখেননি তার উপর ভিত্তি করেই লিখেছেন ঃ- "গোটা গুজরাট যেন একটা

বাড়ি। তার প্রতি দরজা-জানালা বন্ধ। ভিতরে চলেছে একতরফা নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি।"

বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ হলে মহাশ্বেতা দেবী সব দেখলেন কি করে?

থুড়ি, মহাশ্বেতা দেবী তো বলেইছেন, উনি দেখেছেন যত শুনেছেন তার বেশী!

মহাশ্বেতা দেবীর মনে হয়েছে অনশন আর পিকেটিং গুজরাটে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের পথ। তিনি লিখেছেন ঃ-"আমি ডায়াবিটিসের কারণে পারি না, পারলে আমেদাবাদের রাস্তায় আমৃত্যু অনশন করতাম।"

হাসব, না কাঁদব?

আমৃত্যু অনশন করবার কথা যিনি ভাবছেন তাঁর ডায়াবিটিসের ভয়!

বিশিষ্ট গবেষক রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে উদ্যত জনৈক ভদ্রলোকের গল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

গল্পটি এই রকম ঃ-

"এক ভদ্রলোক জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন অন্ধকার রাস্তা ধরে টর্চ জ্বেলে। রাস্তায় এক পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলেপরিচিত ব্যক্তিটি জানতে চাইলেন - মশাই হন্ হন্ করে চলেছেন কোথায়?

আত্মহত্যা করতে উদ্যত ভদ্রলোকের জবাব - নদীতে, এ জীবন রেখে আর লাভ নেই। জলে ডুবে আত্মহত্যা করবো।

- তা হাতে টর্চ কেন?

- রাস্তায় বড় সাপের উপদ্রব।"

এবিষয়ে আর কথা না বাড়িয়েও সহজেই বলা চলে যে এদেশের তথাকথিত মুসলমান দরদী বুদ্ধিজীবীরা যে মানসিক ডায়াবিটিস-এ আক্রান্ত শিক্ষিত মুসলমানরাও তা ধরতে পারছেন না।

শিবসেনার নেতা বাল ঠাক্রের যতই দোষ থাকুক না কেন সম্ভবত তিনিই বুঝেছিলেন যে মুসলমানদের ভোটাধিকার না থাকলে মুসলমান দরদ বলে কিছুই থাকবে না এদেশে।

ভাবুন দেখি অম্লান দত্তের মতো মুক্তমনা স্পষ্টবাদী মানুষ প্রবন্ধ লিখে (আনন্দবাজার) প্রশ্ন তুলছেন যে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে হিন্দুদের

মাথাব্যথার কারণ কি? অম্লান দত্তের মতে এতে তো মুসলমানদেরই ক্ষতি হচ্ছে।

আলোচনার আগে তুলনা করা যাক রাজা রামমোহন রায়ের সময়কালীন অবস্থার কথা। রামমোহন সতীদাহ প্রথা দূর করবার কথা ভাবছেন, গোঁড়া হিন্দুরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন রামমোহনের কাজের। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা তুলে দেবার জন্য আইন জারী করার পরিবর্তে ভাবছেন ইংরেজদের মাথা ব্যথার কারণ কি? সতীদাহ তো আর ইংরেজ মহিলাদের ক্ষতি করছে না। কল্পনা করুন তাহলে কি হতো বিধবাদের?

তবুও ইংরেজরা ভারতীয় সমাজের অংশ ছিলেন না, থাকবার দাবিও করেননি তারা।

কাজেই অম্লান দত্তের মতের পরিপ্রেক্ষিতে কি এই কথাই বলা চলে না যে অম্লানবাবু নিজে যে সমাজের মানুষ, মুসলমানকে সে সমাজের মানুষ হিসেবে দেখেন নি, মুসলমান হিসেবে দেখেছেন। কিংবা এমনও হওয়া সম্ভব অম্লান দত্ত নিজে যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজের বাইরে কাউকে পরামর্শ দেওয়া শিষ্টাচার বহির্ভূত মনে করেছেন। প্রতিবেশীর ছেলের সাথে ঘরের ছেলের ঝগড়ায় প্রতিবেশীর ছেলেকে প্রকাশ্যে দোষারোপ করার চাইতে নিজের ছেলেকে শাসন করাই যেমন ভদ্রলোকের রীতি। অম্লানবাবু সে নীতিতে মুসলমান সমাজকে কিছু বলতে না চাইলেও প্রশ্ন ওঠে দেশভাগের অর্ধশতককাল পরেও মুসলমানরা ঘরের ছেলে হলেন না কেন? অম্লানবাবু ভেবেছেন কি?

অতি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে সংঘটিত 'ইমরানা' কাণ্ড নিয়ে এদেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীরা বোবা হয়ে রইলেন — এরা সকলে নিশ্চিতভাবে অম্লানবাবুর মতের অনুসারী।

আসলে মুসলমান মৌলবাদের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বুদ্ধিজীবীদের নেই। এরাই লড়াই করবেন হিন্দু মৌলবাদের (?) বিরুদ্ধে?

রাজনৈতিক নেতৃত্বেও সেই একই সমস্যা। অহেতুক ভোট হারাবেন কে?

যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীর কিছুটা চক্ষুলজ্জা রয়েছে তাঁরা মুসলমান সমাজ থেকেই প্রতিবাদ ওঠার অপেক্ষায় থাকবার পক্ষে ওকালতি করছেন।

রাজা রামমোহন রায় যে কারণে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আইনের চাইতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করে সমস্যা মোকাবিলা করার ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন, সেই কারণে মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকেই

শাহবানু বা ইমরানাকাণ্ডের প্রতিবাদ ধ্বনিত হবার অপেক্ষায় থাকবার পক্ষে কথা বলবার সময় এদেশীয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যাচ্ছেন যে রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণের দাবি না জানালেও আইন প্রণয়ণের বিরোধিতা করেননি। বরং সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়া অশাস্ত্রীয় কিনা তা জানতে চাইলে লর্ড বেন্টিঙ্ককে রামমোহন জানিয়েছিলেন ঃ- "The Practice might be supressed quietly unobservedly by increasing the difficulties and by the indirect agency of police."

একথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না (এমনকী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কে বলছেন।) যে এদেশে ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা দেশের সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ছে এবিষয়টি আদমসুমারীতে ধরা পড়লেও এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তা মানতে নারাজ।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন তথাকথিত প্রগতিবাদী আরও কয়েকজন এবং তার নয় বছরের কন্যার (?) গবেষণার ভিত্তিতে একটি পুস্তিকা লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির তত্ব হিন্দু মৌলবাদীদের স্বকপোলকল্পিত প্রচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। মুসলমনরা চারটে বিয়ে করেনা, তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অধিক, একথা ভুল।

আরও বহু তথাকথিত সংখ্যাতত্ববাদী (!) নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইছেন মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ছে একথা সঠিক নয়। যুক্তি হিসেবে তারা যা বলছেন তা-ও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন একজন (স্বাতী ভট্টাচার্য) লিখলেন যে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক কথা, মুসলমানদের অনুপাতও বৃদ্ধি পেয়েছে — সে কথা সত্য হলেও বিষয়টিকে এভাবে দেখা উচিত হবেনা কারণ হিন্দু মহিলাদের তুলনায় মুসলমান মহিলাদের সাক্ষরতার হার ১৪শতাংশ কম। অর্থাৎ লেখিকা বলতে চাইছেন যে শিক্ষার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি সারাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

লেখিকা এমনভাবে লিখলেন যে মনে হচ্ছে একটি নতুন তত্ত্ব আবিস্কার করেছেন।

যদি লেখিকার বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলেও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি কি মিথ্যে প্রমাণিত হয়?

প্রবীরবাবু কিংবা স্বাতী ভট্টাচার্যের মতো মানুষদের সঙ্গে খামোখা বিবাদে না গিয়ে ২রা সেপ্টেম্বর, ২০০৩-এর 'দেশ' পত্রিকায় 'সন্তান উৎপাদনের অধিকার' প্রতিবেদনটিতে কি বলা হয়েছে দেখা যাক্।

লেখক লিখছেন ঃ- "..............হরিয়ানা রাজ্য আইন করেছে যে দুটির বেশী সন্তান থাকলে, পঞ্চায়েতে প্রার্থী হওয়া যাবেনা। এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল কিছু মুসলমান গোষ্ঠী, যারা দাবি করেছিল, যেহেতু তারা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে, তাই দুটির বেশী সন্তান হতেই পারে। অতএব, আইনটি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার কারণে অসাংবিধানিক। সুপ্রিম কোর্টের রায় হল, মুসলমান ধর্মীয় আইন চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক করেনি। অতএব, এই আইন মৌলিক অধিকার কাড়েনি, পক্ষপাতদুষ্টও নয়, বরং রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল।"

লেখক আরও লিখছেন ঃ- "বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আমাদের প্রধান বামপন্থী দলের দিল্লীস্থিত ভ্যাটিকান প্রাতিটি রাজনৈতিক ব্যাপারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে অভ্যস্ত হলেও, এ ব্যাপারে একেবারে মুখে কুলুপ।"

পরে লেখক প্রশ্ন করেছেন ঃ- "খুশিমতো সন্তান উৎপাদনের অধিকারের দাবি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সমর্থন করে মুসলিম ভোট কব্জা করার চেষ্টা?"

প্রবীরবাবু এবং তাঁর গবেষণার সঙ্গী আবদুর রউফ, কমলেন্দু ধর এবং এতদিনে অনেক বড় হয়ে যাওয়া 'নয় বছরের গবেষিকা কন্যা'র অবগতির জন্য জানাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য। একদা বিশিষ্ট বামপন্থী হিসেবে পরিচিত সন্তোষবাবু এখন প্রবীরবাবুদের কাছে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় ভূষিত হবেন কিনা জানিনা, তবে মুসলমানদের চারটি বিয়ে, তাদের অধিক সন্তান — এই সমস্ত যদি মিথ্যা ও নিছক হিন্দুত্ববাদীরে প্রচার হবে তাহলে সুপ্রীম কোর্টে মামলা কেন? তথাকথিত প্রগতিবাদীরাই বা কি বলেন?

দেশজুড়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এহেন আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সহজেই বলা চলে — "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।"

স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পর থেকে প্রতিটি আদমসুমারীর প্রতিবেদনে স্পষ্ট এদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, হিন্দু জনসংখ্যা কমে চলেছে।

২০০১ সালের জনগণনাতেও তা ধরা পড়েছে। হিসেবটা দেখা যাক। নানা বিতর্ক তুলেও এ বিষয়ে প্রদত্ত তথ্য মিথ্যে প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

| | হিন্দু | মুসলমান |
|---|---|---|
| ১৯৫১ | ৮৭.২৪% | ১০.৪৩% |
| ১৯৬১ | ৮৬.৮৭% | ১০.৬৯% |
| ১৯৭১ | ৮৬.২০% | ১১.২০% |
| ১৯৮১ | ৮৫.৮৬% | ১১.৭১% |
| ১৯৯১ | ৮৫.০৯% | ১২.৪৯% |
| ২০০১ | ৮০.৫০% | ১৩.৪০% |

এই বিষয়ে পরলোকগত বুদ্ধিজীবী অন্নদাশঙ্কর রায় হিন্দুদের আশ্বস্ত করে বলেছেন যে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে একশতাব্দী পার হয়ে যাবে এবং ততদিনে শিক্ষার অগ্রগতির ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের দুটি বক্তব্যের মধ্যে দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলতে গিয়ে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসকাণ্ডের বিষয়টিকে স্মরণ করা যেতে পারে। অন্নদাশঙ্কর রায় এই ধ্বংসকাণ্ড দেখে যেতে পারেননি। কাজেই তাঁর জানা সম্ভব হয়নি যে, যে সন্ত্রাসবাদীর পরিচালনায় ঐ ধ্বংসকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার মূল পাণ্ডা মুহম্মদ আত্তা ছিলেন একজন পেশাদার স্থপতি ও নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ।

আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনের ঠিক পরবর্তী নেতা ও মিশরের মানুষ আয়মান আল-জায়াহিরি একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও শল্য চিকিৎসাবিদ্। 'ওয়াল স্ট্রিট' জার্নালের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্ল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তালিবান নেতা ওমর শেখ লণ্ডন স্কুল অফ ইকনিমিক্সের ছাত্র। তার ইস্কুলজীবনও ব্রিটেনেই শুরু হয়েছিল। মার্কিন দেশে বসবাস করেও আত্তা তাঁর ডাইরীতে এই বিশ্বাসই ব্যক্ত করে গেছেন যে ঐ ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়ে তিনি 'কোরাণ শরীফ'-এর বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর বেহস্‌তে বসবাস করার অধিকারী হবেন।

স্বভাবতই অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন বলেছেন যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের গোঁড়ামী দূর হয়ে যাবে তা নিতান্তই দূরাশা ছাড়া কিছু নয়।

এদেশের বহু মানুষই 'কোরাণ শরীফ' পড়েননি। কাজেই 'কোরাণ শরীফ'এ বর্ণিত বেহস্‌ত অর্থাৎ স্বর্গের সুখের বিবরণ তাদের জানা সম্ভব নয়। বেহস্‌তের যে বিবরণ আছে তা জানলে শুধু মুসলমান কেন অন্যান্য অনেকেই আকৃষ্ট হতে

পারেন।

কি আছে 'কোরাণ শরীফ' -এ বর্ণিত বেহস্‌তে —

সূরা / রুকূ / অয়াত
নাবা / ২ / ৩২ - উদ্যান, দ্রাক্ষা
৩৩ - সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী
৩৪ - পূর্ণ পানপাত্র *
রাহ্‌মান / ৩ / ৫৬ - আয়তনয়না তরুণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।
৭০ - সুশীলা ও সুন্দরী রমণীগণ
ওয়াকিয়া / ১ / ৩২ - পর্যাপ্ত ফলমুল
৩৪ - সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী
৩৬ - ঐ, চিরকুমারী
৩৭ - ঐ, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা
দাহর / ১ / ১৯ ..........সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরগণ, ওদের দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।
২০ - ভোগবিলাসের উপকরণ ...........

বলার অপেক্ষা রাখে না শিক্ষার অগ্রগতি বেহস্‌তের আকর্ষণকে কমাতে আদৌ সক্ষম হবেনা। আবার 'কোরণ শরীফ'-এর মতে বেহস্‌তে যাবার সর্বোত্তম পন্থা ইসলামের প্রতি আস্থাহীনকে হত্যা এবং জেহাদ্ এ যোগদান করা।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীকে একবার প্রশ্ন করায় গান্ধীজী উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁকে তাঁর মুসলমান বন্ধুরা জানিয়েছেন কোরণে যে কাফেরকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে, তারা হিন্দু নন, অবিশ্বাসী অর্থাৎ নাস্তিক।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে কাফের বলতে হিন্দুদের বোঝানো হয় নি তাহলেও দাঁড়ালো এই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হলে যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার সমর্থন কোরণ শরীফ-এ রয়েছে। অহিংসার পূজারী গান্ধীজীও এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন এবং এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ! অন্তত কোন ধর্মগ্রন্থ মানুষকে হত্যা করার বিধান দিচ্ছে জেনেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি !

মূর্তিপূজা কিংবা কাফেরদের কথা বাদই দেওয়া গেল গান্ধীজী নিজে কোরাণ শরীফ পড়েছেন বললেও কিভাবে তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল কোরণ শরীফভূ

সূরা 'মায়েদাহ' - এর সেই আয়াতটি, যেখানে স্পষ্ট নামোল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ-'ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে।" (রুকূ - ৮, আয়াত - ৫১)

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান ব্যহত হলো কিনা তা বড় কথা নয়। বড় কথা ভারতবর্ষকে ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী দার-উল-হারাব্ থেকে দার-উল-ইসলামে পরিবর্তন করতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধ। দেশভাগ করার মধ্যে দিয়ে সে সম্ভাবনাকে কিছু পরিমাণে দূরে ঠেলে দেওয়া গেলেও ব্যপক অনুপ্রবেশ আর জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবার ফলে বিপদ তরান্বিত হচ্ছে।

অন্নদাশঙ্কর রায় এদেশে বাংলাদেশ থেকে মুসলমান জনসাধারণের অনুপ্রবেশকে মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে বলেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় একসময় সরকারী উচ্চপদে ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনকে সম্মান জানাতে হয় ;রাষ্টের নিরাত্তার বিষয়টি নিয়েও অবহেলা করা চলেনা — শ্রীরায় সেসব ভালো করেই জানতেন। উপরন্তু তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়, কাজেই কার্ল মার্কস বর্ণিত রাষ্ট্রের শুকিয়ে যাবার তত্বে (State will be wither away) বিশ্বাসের কারণে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে সকল দেশের সকল মানুষ একাকার হয়ে যাবেন — এমন ভাবনা থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় অনুপ্রবেশকে গুরুত্ব দিয়ে চাননি এমনও নয়।

মানবিক দৃষ্টি দিয়ে সমস্যাকে দেখবার যে কথা অন্নদাশঙ্কর বলেছেন তা একেবারে উড়িয়ে দেবার বিষয় না হলেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কি মরিচঝাপিতে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের যখন রাষ্ট্রের প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করে উচ্ছেদ করা হলো, তখন আমাদের মানবিকতাকে আমরা কোথায় এবং কোন মোহের পদমূলে বন্ধক দিয়ে রেখেছিলাম?

১৯৭১ সালে যুগান্তর পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর রায় 'এই প্লেগ' নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ-

"এদেশে মুসলমান বিদ্বেষ এপিডেমিক হয়ে গেছে। এখানে এমন একটি দল আছে যারা পারলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, না পারলে ভারত সংস্কৃতির আওতায় আনবে।"

মুসলমান জনসংখ্যা এদেশে ১৯৭১ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ১১.২০ শতাংশ, ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩.৪০ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে একজন মুসলমানকেও কেউ তাড়িয়ে দেয়নি। অন্নদাশঙ্কর যে দলটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, গত কয়েকবছর সেটি ভিন্ন নামে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় ছিল, একাধিক রাজ্যে আজও সে দলটি নিরঙ্কুশ। ১৫কোটি মুসলমানকে তাড়িয়ে দেবার আবস্তবতার কথা বাদই দেওয়া গেল।

মুসলমানদের ভারতীয় হতে বলার প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় নিজে একসময় কি বলেছিলেন তা দেখা যাক।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' শীর্ষক রচনা প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য ঃ- "যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন ও আজও মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মতন থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমান কাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনাবোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতর একটি রাষ্ট্র রচনাই যাঁদের স্বপ্ন, আমরা তাঁদের কে, যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাব?"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একসময় আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানের সহিত্য সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্যে দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই কারণ সাহিত্য সেবকরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন ঃ- "প্রতিকার যদি থাকে, তবে সাহিত্যে নয় —- তা স্বজাত্যে।"

লিখেছিলেন ঃ- "ঐক্য জিনিসটা organic ;হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয়না, তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙালী হয়না, ভারতীয় হয়না।"

পরে আর এক স্থানে লিখেছেন ঃ- "হিন্দু-মুসলমানে আপস ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবেনা, আত্মীয়তাও নয়।"

অন্নদাশঙ্কর রায় কোথাও বলেন নি মুসলমানরা অধিকাংশই যথার্থই ভারতীয় হয়ে উঠেছেন কিনা। বরং পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তৈরী হয়ে যাবার পর সে সম্ভাবনা যে একান্তই লুপ্ত হয়েছে, অন্নদাশঙ্কর তা অনুভব করেছেন কি না জানা না গেলেও দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার জন্য অন্নদাশঙ্কর রায়ের দুঃখকে মুসলমানরা কি চোখে দেখেছেন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

'মাহেনও' নামে পাকিস্তানের একটি সরকারী পত্রিকায় জুলাই ১৯৫০ সালের একটি সংখ্যায় করাচি শহরে বাঙ্গালীদের দ্বারা আয়োজিত নজরুল জয়ন্তীর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিরোনাম — 'করাচিতে পহেলা নজরুল জয়ন্তী'

ঐ প্রতিবেদনে নজরুলের ছবির পাশে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি ছড়া ছাপানো হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার বই 'উড়কি ধানের মুড়কি' থেকে সংকলিত সেই ছড়া ঃ-

"ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো
নজরুল।"

'মাহেনও' -তে প্রতিবদেনটি প্রকাশিত হলে পূর্ববাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান।

'তাহজীব' পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় সম্পাদকীয় লিখে সরকারী পত্রিকায় কোনো হিন্দুর লেখা পাকিস্তানের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তিচিত ছড়া প্রকাশ করে সরকারী অর্থ ধ্বংস করার জন্য 'মাহেনও' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে একহাত নেওয়া হয়।

দেশভাগের জন্য দুঃখপ্রকাশ যে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নামান্তর তা ধরে নিয়ে পূর্ববাংলার মুসলমান সাহিত্যিকরা বিভিন্ন লেখায় অন্নদাশঙ্করের নিন্দা করেন।

এখনও মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় হয়ে উঠতেপারেন নি, সে সত্য উপলব্ধি করার জন্য দেশের মানুষ কোনো বিশেষ দলের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে নেই।

দেশের বিশিষ্ট মানুষেরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে, এ বিষয়ে কি বলেছেন খোঁজ নিয়ে শুধু তাঁদের কয়েকজনের মন্তব্য পরপর সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ- "হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব-প্রায় করে তুলছে আর একটি প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ

নেই।"

রবীন্দ্রনাথ অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছেন যে আফগান বা অপর কোনো মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কিনা। জবাব তাঁরা যা দিয়েছেন তাতে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ- "আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে সরাসরি প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছেন অন্যান্য মনীষীরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তার বাইরে অন্য কিছু অনুভব করেননি।

শরৎচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন ঃ- "...........মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে — এদেশে চিত্ত তাহার নাই।" (শরৎরচনাবলী - জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ- ৪৭৫)

আরও আগে বিপিনচন্দ্র পালের মতো নেতারাও লক্ষ্য করেছেন ঃ- "ভারতবর্ষের মুসলমানরা মুসলমান আগে, ভারতবাসী পরে। অতএব, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে যদি ভারতের মুসলমানগণের নিকট ভারতবাসীত্ব অপেক্ষা মুসলমানত্ব বড় হয়, তাহা হইলে ভারতরাষ্ট্রের বা প্রভুশক্তির সঙ্গে যদি কখন কোন মুসলমান রাষ্ট্রের বা মুসলমান প্রভুশক্তির যুদ্ধ বিগ্রহাদি বাধিয়া উঠে, তখন সৈয়দ আমির আলি প্রভৃতি প্যান্-ইস্লামী মুসলমান লোকনায়কগণের মতে ভারতের রাষ্ট্রশক্তির প্রতিকূলে বিপক্ষ মুসলমান রাষ্ট্রের বা মুসলমান প্রভুশক্তির আনুকূল্য করাই একান্ত ধর্মসঙ্গত হইবে।" (রাষ্ট্রনীতি, বিজয়া - ১৩১৯)

বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ — কেউই প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন বলে বিপিনচন্দ্র পালের বাবা পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

প্রকৃত ভারতীয় মুসলমান ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম স্থপতি আবদুল হালিম প্রশ্ন তুলেছেন ঃ- "এদেশে বাস করে, এদেশে মানুষ হয়ে মুসলমানদের অন্তরে যদি এদেশের ওপর একটি মমত্ববোধ না জন্মায়. তাহলে তার চেয়ে বেশী দুঃখ আর কি হতে পারে?" (লাঙল, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬)

সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ '৯২সালে বিহারের ভাগলপুরে গেলেন '৮৯-'৯০ সালে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন লিখবার

জন্য। রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশ পেল।

গৌরবাবু লিখলেন ঃ- "হিন্দুরা কি নির্মম, নৃশংস, শিশু হত্যা করেছে, একটি মুসলমান মেয়ের পা কেটে নিয়েছে।"

প্রতিবেদনে কোথাও হিন্দুদের উপর মুসলমানের অত্যাচারের কোন কথা নেই। দাঙ্গার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও অন্য হিন্দু সংগঠনের উপরে।

পরবর্তীকালে শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'দাঙ্গার ইতিহাস' -এ তেমন কথাই লিখলেন।

কিন্তু ধর্মের কল সম্ভবত যথার্থই বাতাসে নড়ে। ২রা এপ্রিল, ২০০৩-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'দাঙ্গা-অভিযুক্ত খুন' শিরোনামে সংবাদে লেখা হলো ঃ- "বিহারের ভাগলপুরের '৮৯ দাঙ্গার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ এনায়েতুল্লা আনসারি খুন হলেন বেনিয়াপুকুরে। শনিবার সন্ধ্যায় সার্কাস অ্যাভিনিউয়ে অজ্ঞাত পরিচয় দু-তিন জন দুস্কৃতী তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে। এনায়েতুল্লা বিহারের জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে দক্ষিণ ২৪-পরগণার মল্লিকপুরে আত্মগোপন করে ছিল। এই খুনের তদন্তে বেনিয়াপুকুর থানার তদন্তকারী অফিসার ভাগলপুর গিয়েছেন। বছর দশেক এনায়েতুল্লার আত্মগোপন করে থাকতে পারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ভিন রাজ্যের অপরাধীদের কাছে এ রাজ্য এখনও অভয়ারণ্য।"

এরপরেও ধর্মের কল কিন্তু নড়েই চলল।

২০০৫ সালে প্রকাশ পেল বিহারের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহের আত্মকথা। ভাগলপুর দাঙ্গার সময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সত্যেন্দ্রবাবু। কয়েক পুরুষের কংগ্রেসী। বাবা অনুগ্রহনারায়ণ সিংহও বিহারের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ তাঁর লেখায় ভাগলপুর দাঙ্গার জন্য কংগ্রেসের দুই নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগৎ ঝা আজাদ ও বিধানসভার স্পীকার শিবচন্দ্র ঝাকে দায়ী করেন। কংগ্রেস নেতারাই ষড়যন্ত্র করে দাঙ্গা বাধিয়েছিলনে একথাও জানান সত্যেন্দ্রনারায়ণ।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে যিনি ছিলেন সেই মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদ সংগ্রহের উপর আমরা বেশী গুরুত্ব দেব, না গৌরকিশোর ঘোষ, শৈলেশ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার উপর?

গৌরকিশোর ও শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা লিখেছেন তার সূত্র সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেননি। কাজেই লেখাতে তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস-এর প্রতিফলন ঘটেছে যা আদৌ সত্য না হওয়াই সম্ভব। বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা এখানে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না?

তসলিমা নাসরিনের 'দ্বিখণ্ডিত' প্রকাশ হবার পর বিতর্ক শুরু হলে একদা "মার্কিনঘেঁষা" অভিযোগে নিন্দিত, বর্তমানের বামফ্রন্টের রাজকবি সমপর্যায়ের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তসলিমার বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বই-এ ধর্মবিষয়ক কোন বিতর্ক না থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মন্তব্য করেছেন।

ধর্ম বিষয়ে কবি সুনীলবাবুর কেনোদিনই কোনো মোহ ছিল বলে জানা নেই। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে হিন্দু দেবদেবী — রাধাকৃষ্ণ, কালী সম্পর্কে সুনীলবাবু নানা মন্তব্য করে তাঁর রচনাকে বিতর্কিত করে ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছেন। এবিষয়ে কেউ কেউ যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেও সুনীলবাবুর কণ্ঠরোধ করাবার কথা ঘুণাক্ষরেও বলেননি। ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ সম্পর্কে কিছু কথা বলায় হঠাৎ করে সুনীলবাবুর বিবেচনাবোধ জেগে উঠল কেন?

জনৈক জীবনমুখী গানের গায়কের না হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পিছনে কিছু বাস্তব তাগিদ ও কিছু বাস্তব দায় এড়ানোর কৌশল ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু সুনীলবাবুর বেলায়? অবশ্য বাংলাদেশে নিজের লেখা বই কাটতির সম্ভাবনা মাথায় রেখে সুনীলবাবুর বোধদয় ঘটে থাকলে বাস্তব দায় শিরোধার্য।

একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অদ্ভুত অদ্ভুত ফতোয়া দিয়ে চলেছেন। তথাকথিত প্রগতিশীল সরকার তাদের গুরুত্ব দিয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এমনকী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকেও সমূলে উৎপাটন করছে।

তসলিমা নাসরিনের লেখা বই-এর বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা রে-রে করে উঠলেন। নিষিদ্ধ হলো তসলিমার বই। হাইকোর্টের রায়ে সরকারের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা বাধা পেল সত্যি কথা, কিন্তু মানুষের কাছে কি বার্তা পৌঁছোলো?

শিশুদের পাঠ্যবই-এ ছৌনাচের ওপর লেখা প্রবন্ধে গণেশ বন্দনা আছে বলে তাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেলেন তথাকথিত সরকারী বুদ্ধিজীবীরা। গণেশ

বন্দনা বাদ দেওয়া হলো। কিন্তু বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করছেন এমন বিশেষজ্ঞ সনৎ মিত্র জানিয়েছেন ঃ- "গণেশ বন্দনা ছৌ নাচের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি এক অনুষ্ঠানে একাধিক দল নাচলেও প্রতিটি দল আলাদা করে গণেশ বন্দনা করে। এই অংশ ছেঁটে ফেলা অন্যায় হয়েছে। এই পথ ধরলে তো চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র — বাংলা সাহিত্যের গোটা মধ্যযুগটাই বাদ দিতে হয়।"

অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ- "পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতিতে পিতৃদেবের আত্মজীবনী বিচারকালে মুসলমান পক্ষের বিচারক মহর্ষির দিদিমার মৃত্যুকালীন ঠাকুরদেবতার নামোচ্চারণের বিবরণ-মাত্রকেই অপত্তিজনক বলে মত দিয়েছিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত আপত্তি কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধেই খাটছে। ............ ওঁরা বাংলা বিদ্যালয়ে পাঠ্য ইংরেজি সাহিত্যকে বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের রোচক করে পরিবর্তন করার প্রস্তাব এখনো পর্যন্ত করেন নি। একেই বলে কম্যুনালিজম, এই কম্যুনালিজমের উপরই বাংলাদেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিৎপত্তন হলো।"

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ঃ- "ঘুষ দিয়ে প্রকৃত মিলন হয়না।"

অতীতে হয়নি। দেশভাগ ঠেকানো যায়নি। আবারও যদি ঠেকানো না যায় তাহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'সহজপাঠ'-এর বিশ্লেষণ করে একজন পণ্ডিতম্মন্য আবিষ্কার করেছেন 'সহজপাঠ'-এ হিন্দু নাম ৮৬টি, মুসলিম নাম ২টি এবং খ্রিষ্টান নাম মাত্র ১টি এবং গবেষণার আবশ্যম্ভাবী ফল বইটি 'সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট'।

এই জাতীয় 'জাতের নামে বজ্জাতি' গবেষণা গুরুত্ব পাচ্ছে ভাবলেও শঙ্কিত হতে হয়। এই পদ্ধতিতে চলতে গেলে মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলার লেখকদের খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের লেখা বই-এ জেলার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে যথাক্রমে শতকরা ৬৫টি এবং ৫৫টি চরিত্র যেন মুসলমান হয়! তা না হলে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হলে কিছু করার থাকবেনা। এখন তো এমনও মনে হচ্ছে যে কোন লেখক যদি পাঁচটি বই লেখেন তবে তার একটি অন্তত উর্দুভাষায় লেখা হতে হবে — তা না হলেই সমূহ বিপদ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম' গানটি নিয়ে যত টানা-হেঁচড়া চলেছে তা জানতে পারলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যুক্তিবাদী মানুষ দেশের সমস্যা

লাঘবের কথা ভেবে গানটি হয়তো লিখতেনই না।

'বন্দেমাতরম' গানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ গানটিতে হিন্দু দেবীর কথা আছে। এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এখনও লোকসভায় গানটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু কেন? আসলে এদেশে এমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা এখনও যথেষ্ট যারা দেশভাগের মধ্যে দিয়ে সমাধান হয়ে গিয়েছে এমন সব সমস্যাগুলিকে ঝুলির থেকে টেনে এনে নতুন 'যোগেন মণ্ডল' হবার স্বপ্ন দেখছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম'-এ এদের গাত্রদাহ হয়। অথচ এদের অনেকেই যখন নিজেদের রবীন্দ্রানুসারী বলে চিহ্নিত করে গর্ব অনুভব করেন তখন এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বিচার করে দেখবেন না?

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত নিয়ে মুসলমানদের আপত্তির বিষয়টি নিয়ে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। এর আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত জানিয়েছেন। ১৯৩৭ এর ৬ই আক্টোবর তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ-

"An unfortunate controversy is raging round the qustion of stability of 'Bande Matram' as national song. In offering my own opinion about it I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress. To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficient aspects of our motherland made spcial appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those protions of the book of which it is a part, with all sentiments of which, brought up as it was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.

It first caught on as an appropriate national anthem at the poignant period of our strenuous struggle for asserting the peoples will against the decree of separation hurled upon our province by the rulling power. The subsequent developments dur-

ing which 'Bande Mataram' became a national slogan cannot, in view of the stupendour sacrifices of some of th best of our youths, be lightly ignored at a moment when it has once again become necessary to give expression to our triumphant confidence in the victory of our cause.

I freely concede that the whole of Bankim's Bande Mataram' poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might sound Moslem suspectibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original powem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community." (Amrita Bazar Patrika, November 2nd, 1937).

অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম' গানটির যে অংশ জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে গীত হয় তা নিয়ে কোন বিতর্ক থাকাই উচিত নয়। অথচ এখনো এ নিয়ে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর সংকোচ যেন কাটেনা।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথকেও তো এখন সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলা হচ্ছে।

দেখা যাক জওহরলাল কি বলেছেন এ বিষয়ে, বিশেষ করে তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ যখন এখনো ওঠেনি। ১৯৩৭সালেই কংগ্রেস অধিবেশনে এক বক্তৃতায় জওহরলাল বলেছেন ঃ-

"....... the first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to, unless he is maliciously inclind. Remember, we are thinking in terms of a national song or all India".

প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভূক্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয় সর্বজনবিদিত। তাঁর মতে 'বন্দেমাতরম' গানটি আদৌ "পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা-প্রণোদক নহে ............. মুসলমানবিদ্বেষ-প্রসূত বা মুসলমান বিদ্বেষ-জনক নহে।"

অগ্রহায়ণ ১৩৪৪-এর প্রবাসী পত্রিকাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিস্কারভাবে

তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বিতর্ক, কিন্তু-কিন্তু ভাব এখনও রয়েছে, যা জওহরলাল যেমন বলেছেন তেমনিই যথার্থই অভিসন্ধিমূলক।

দেখা যাক কি বলা হয়েছে এমনকী 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের সেই অংশে যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

দেশমাতাকে বন্দনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে —

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী"

তুমি-ই (দেশমাতা) দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা।

"কমলা কমল-দলবিহারিণী"

তুমি-ই (দেশমাতা) পদ্মফুলের উপর উপবিষ্টা লক্ষ্মী।

"বাণী বিদ্যাদায়িনী ........"

তুমি-ই (দেশমাতা) বিদ্যাদাত্রী-জ্ঞানদায়িনী।

সমস্ত গান জুড়ে দেশমাতার বন্দনা করে তাঁর মধ্যেই খুঁজে নেওয়া হয়েছে দুর্গা, লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীকে। অর্থাৎ দেশমাতাই দেবী — অন্য কেউ নন। কাকে বড় করা হল — তথাকথিত দেব-দেবীকে না দেশমাতাকে?

তর্কের খাতিরে যদি বলা হতো 'দেশ তুমিই আমার কাছে আল্লা-খোদা' - তাহলে কি হতো? মুসলমানরা মেনে নিতেন যে তাদের 'আল্লা' অন্য কেউ নন — 'দেশ'?

অযোধ্যা নিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতাও প্রকট। অযোধ্যার বিষয়টি বিচারাধীন। হিন্দু-পরিষদ বা ঐ জাতীয় প্রষ্ঠিানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যা 'বিশ্বাসের বিষয়' তাতে বিচারালয়ের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুপরিষদের যুক্তি না মেনে বিচারের রায়ের জন্য অপেক্ষা করার পক্ষপাতী। নিজেদের দাবির স্বপক্ষে হিন্দুপরিষদ অযোধ্যায় বিতর্কিত ভূখণ্ডে মন্দিরের অস্তিত্বের কথা বললেও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। আদালত যখন মন্দিরের দাবির সত্যতা খুঁজে দেখবার জন্য সঙ্গত কারণেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে মাটি খুঁড়ে দেখতে বলেছেন, তখন স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ ইরফান হাবিব কিংবা রোমিলা থাপার সদলবলে ওখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পরার আশঙ্কায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করে আগেই দেখিয়ে দিলেন যে সত্যের মুখোমুখি হবার জন্য তাঁরা

আদৌ উৎসাহী নন। একে গণতন্ত্র কিংবা সত্যতার বিরুদ্ধে ধষ্টামো ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

সন্ত্রাসবাদী এই অভিযোগে ধৃত সৈয়দ আবদুল রহমান জিলানীকে আদালত শাস্তি দিলেন। এই শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে নিজেদের দ্বিমত পোষণ করতে গিয়ে রজনী কোঠারী, অরুন্ধতী রায় প্রমুখ এমনকী বিচারকের রায় ভুল বলেও মন্তব্য করলেন। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করার নানা উপায় থাকা সত্বেও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যকে কেন আদালত অবমাননা বলে ধরা হবেনা? সাধারণ মানুষ এরকম বললে তার কি অবস্থা হতো?

ইদানীং উগ্র (Ultra) ধর্মনিরপেক্ষদের কাছে এমনকী প্রগতিশীল ও বামপন্থী বলে পরিচিত শিল্পী-সাহিত্যিকরাও রেহাই পাচ্ছেন না। ঋত্বিক ঘটক সাবেক পূর্বপাকিস্তানের থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তুদের নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন তাতেও অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়ে নাসিকা কুঞ্চন করছেন। ঋত্বিক ঘটক তাঁর নির্দেশিত চলচ্চিত্রে হিন্দু আইকন (?) ব্যবহার করেছেন এমন অনুযোগ করেছেন এক বন্ধুস্থানীয় লেখক তাঁর রচনায়। (যুক্তি-তর্ক-ঋত্বিক - সুগত সিংহ)

কেউ হিন্দুসমাজের ছবি আঁকলে মুসলমানদের বঞ্চনা করছেন, সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হচ্ছেন। মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে কোন কুশ্রীতা নির্দিষ্ট করলেও সাম্প্রদায়কি আখ্যা পাচ্ছেন! এ যে হীরের ধারের অবস্থা!

আসলে এসবই মুসলমান তোষণের এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আদর্শ, কর্মপ্রণালী নিয়ে মতভেদ আছে। বহু বিষয়ে এদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। এমনকী অতি সম্প্রতি সংগঠনটির সর্বোচ্চ পদাধিকারী এদেশের জনভারসাম্য বজার রাখার জন্য হিন্দুদেরকে বহু সন্তান জন্ম দেবার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাকে কেউ যদি 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' বলে চিহ্নিত করতে চান, তাহলেও তাকে এককথায় নিন্দুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বস্তুত জনসংখ্যাধিক্যের যে সমস্যা মুসলমানদের পশ্চাদগামিতার অন্যতম কারণ, হিন্দুদেরকেও তা আঁকড়ে ধরতে বলা কিছুতেই, এমনকী কোনো গভীর সমস্যারও, প্রতিবিধান হতে পারেনা। এবিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চলবেই। কিন্তু গান্ধী হত্যার সঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে জড়িয়ে নিন্দামন্দ করার যৌক্তিকতা কোথায়? 'The Statesman'

পত্রিকার সম্পাদক ইরানীকে তাঁর পত্রিকায় গান্ধী হত্যার সঙ্গে অর.এস.এসকে জড়িয়ে সম্পদকীয় লেখার জন্য আদালতের নির্দেশে ক্ষমা চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়েছে। যদি বলা হয় যে আদালতের চুলচেরা বিচারের ফাঁকে আর.এস.এস রেহাই পেয়েছে, তাহলেও বিষয়টি নিয়ে এখন অন্তত আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না — বিশেষত বিশিষ্ট গবেষক ডঃ আশিস নন্দীর গবেষণা প্রকাশিত হবার পর।

প্রসঙ্গত আশিস নন্দী কি বলেছেন তা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না। নচেৎ আর.এস.এস-এর ধ্বজা ওড়ানোর অভিযোগ ওঠার সম্ভাবনা প্রবল।

গান্ধী হত্যাকাণ্ডের নায়ক নাথুরাম গডসের সম্পর্কে শ্রীনন্দী লিখেছেন ঃ- "আর.এস.এস. যথেষ্ট জঙ্গী বলে মনে হয়নি তার, সে জন্য বছর খানেকের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন সংগঠন 'হিন্দু রাষ্ট্র দল' গঠন করেন।" (গান্ধী পরিক্রমা, পৃ-৩৮৪)

ডঃ নন্দী, আর.এস.এস কিংবা তার ধারে কাছে রয়েছে এমন কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এমন কথা সম্ভবত তাঁর পরম শত্রুও বলতে পারবেন না।

গত ৬.৩.২০০৩ এ আনন্দবাজার পত্রিকায় ধান্দাবাজ রাজনৈতিক পিগমীদের হাতে এটাই ভবিতব্য শিরোনামে সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় যখন লেখেন ঃ- গোধরার জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নিন্দাও কেবলই কেতাবি। ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে যেসমস্ত কংগ্রেস নেতা ধরা পড়েছেন, রাজ্য বা কেন্দ্রের দলের নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত রা কাড়েননি পাছে সংখ্যালঘু ভোট নষ্ট হয়ে যায়" — তখন অন্তত এইজন্যও তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয় যে মূল সমস্যার লেজ ধরে সামান্য টানটুকু অন্তত তিনি দিয়েছেন। অবশ্য সুমনবাবুও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সত্যান্বেষী সাংবাদিকদের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি তা তার অন্যান্য লেখাতেই স্পষ্ট।

পাছে 'হিন্দু' — এই অপবাদে কোণঠাসা করা হয় এ ভয়ও আজ অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে।

শুধু যে মিথ্যাচার করেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অথবা সাংবাদিকরা ক্ষান্ত হচ্ছেন তা নয়, অযৌক্তিক তোষণ নীতি চালাতে গিয়ে এমন স ব কাণ্ড করছেন যার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

অতি সম্প্রতি আচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির বিশ্লেষণ করে একদল সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করেছেন। নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিতে যথেষ্ট মুসলমান চরিত্র নেই — এই হাস্যকর অভিযোগ করতেও লজ্জিত হচ্ছেন না এরা।

এইভাবে ভারতীয় শিল্পী-সহিত্যিকদের মধ্যে কত সাম্প্রদায়িকতা আছে তা প্রমাণ করার জন্য এরা যেন 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান।'

ছৌ নাচ বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে 'গণেশ বন্দনা' সরিয়ে দিয়ে তাকে খণ্ডিত করার বিষয়টি আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ইসলামের নামে যে সব অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে ভারতবর্ষে সে সমস্ত ইতিহাসের বই থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে (সারকুলার নং এস.ওয়াই.এল /৮৯ / ১ তারিখ ২৮.৪.৮৯)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস বদল করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শবিষয়ক ৫০ নম্বরের বদলে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমেদের চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (যুগের ডাক - ১৬.৩.২০০২)

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে সৈয়দ আহমেদের হিন্দু-মুসলমানবিষয়ক দ্বিজাতি-তত্ত্বের ইতিহাস অগ্রাহ্য করা হবে কেন?

সাংবাদিক অনিন্দ্য জানা আনন্দবাজারে "সাইফিজ আহমেদ? মুসলমান? প্রবলেম আছে ভাই, হলনা" লিখে হিন্দুবাড়িতে মুসলমানকে বাড়ি ভাড়া দেবার ব্যাপারে অনীহার কথা লিখেছেন।

'মুসলমান' হিন্দুর কাছে অন্তত শহরে অচ্ছ্যুৎ, বিশেষত কলকাতার মতো শহরে --— একথা শতকণ্ঠে শ্লোগান তুললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। নিজাম, সিরাজ, আমিনিয়ায় ক'জন হিন্দু খেতে যায় এবং ক'জন মুসলমান খেতে যায়, সেই পরিসংখ্যান অনিন্দ্যবাবুর নেওয়া উচিত ছিল। যাইহোক অনিন্দ্যবাবু কিন্তু অনীহার কারণ অনুসন্ধান করতে মোটেও উৎসুক নন। যদিও বেশী গবেষণা করার দরকার নেই। তিনি যে জগতের সঙ্গে যুক্ত অথবা অন্য যে কোন খবরের কাগজে প্রকাশিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের নামগুলির প্রতি (খুব বেশী হলে সাতদিন) যদি নজর দিয়ে জনসংখ্যার অনুপাতে অপরাধীদের অনুপাতের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নেন, তাহলে বুঝতে পারবেন মুসলমানকে বাড়ি ভাড়া দেবার বিষয়ে হিন্দুর অনীহার কারণ।

অনিন্দ্যবাবুর বর্ণিত আপাত দৃষ্টিতে, গোলমেলে নয়, দেখতে-শুনতেও

চমৎকার তো দূরস্থান, সমাজে অতি উঁচু জায়গায় রয়েছেন এমন মুসলমানকেও হিন্দুদের পক্ষে বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়, যখন তারা দেখেন যাকে একজন প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমিক বিধায়ক বলে জানতেন তিনি একজন বিদেশী চরের সহায়ক (প্রতিদিন - ১২.১২.২০০৩), যাকে মাদ্রাসার এক সম্মানিত প্রধানশিক্ষক বলে জেনেছেন তিনি রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের হোথা (আনন্দবাজার- ২৭.৩.০৩), যাকে বহুদিন প্রিয় খোলোয়াড় বলে জেনেছেন তিনি একজন পাকিস্তানি এজেন্ট (প্রতিদিন - ৯.১২.০৩) এবং এরা সবাই মুসলমান, তখন হিন্দু বাড়িওয়ালা সম্ভাব্য ঝামেলা এড়ানোর জন্য আপাতদৃষ্টিতে ভালো মুসলমান সাইফিজ আহমেদ কে ভাড়া দিতে অস্বীকার করবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

এখানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী. সাংবাদিকরা রে-রে করে উঠবেন তা বলা বাহুল্য। হিন্দু অপরাধী হয় না? ধর্ষক হয় না? খুনী হয় না?

অবশ্যই হয়, একশো বার হয়। কিন্তু সবচাইতে ঘৃণ্য দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হন অতি সামান্যই। আসলে এবিষয়টি যথার্থ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কেও ভাবতে হবে গুরুত্ব সহকারে।

এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বাল ঠ্যাকারেকে ফাঁসি দেবার দাবি জানিয়েছেন বহুবার। মইনুল হাসানকে 'ধর্মদ্রোহী' বলে লোক খেপিয়ে তুলছেন যে সব ইমামরা তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন কি?

কাশ্মীর থেকে লক্ষাধিক হিন্দু বিতাড়িত হয়ে দিল্লীতে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছেন। এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের জন্য একটি লাইনও কোথাও খরচ করেননি তাদের লেখায়। প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত এদের ভালোবাসা মানুষের জন্য? না শুধুই মুসলমানের জন্য?

তথাকথিত প্রগতিশীল হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বিশিষ্ট মুক্তমনা প্রবন্ধকার পাঁচু রায় যখন বলেন যে এরা ঃ- "মুসলমানদের চেয়ে বেশী ইসলাম ভক্তি দেখান" (দর্পণে মুক্তমন - শারদসংখ্যা ১৪১২) — তখন বোঝা যায় উদ্দেশ্যমূলক মনোবৃত্তি ক্রমশঃ ধরা পড়ছে।

অতি সম্প্রতি আরও একটি বিষয় নিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক বিচিত্র মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। বিষয়টি ভারতবর্ষে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরী করার প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সংবিধানের ৪৪তম ধারায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা বলা হয়েছিল ; ভারতবর্ষের জটিল জাতিব্যবস্থার কথা মনে রেখেই। সংবিধান প্রণেতারা গোড়াতেই এই ধরনের একটি বিধি দেশকে দিতে না পারলেও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভেবেছিলেন সঙ্গত কারণেই। দেশবিভাগোত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইদানীং কিছু মানুষ সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় উল্লিখিত প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার ও ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলবার অধিকারের সঙ্গে ৪৪ নম্বর ধারার বিরোধ আবিষ্কার করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির যৌক্তিকতাকেই নস্যাৎ করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সুরে সুর মিলিয়ে এরাও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবিকে সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করছেন। সংবাদপত্রে দু'কলম লেখা উঠতি সাংবাদিকরাই আবার এজাতীয় কুযুক্তিতে বেশী করে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। দু'কলম লেখার সুবাদেই এরা পোড়খাওয়া, বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংবিধান প্রণেতাদের চাইতেও বেশী বিজ্ঞ মনে করছেন নিজেদেরকে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী একবার মন্তব্য করেছিলেন ঃ- "সাংবাদিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুর্খের পাণ্ডিত্য প্রকাশ।"

এতটা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা অনুচিত হলেও ঐ সমস্ত উঠতি সাংবাদিকদের যুক্তি শুনলে ভিরমি খেতে হয়।

জনৈকা সেমন্তী ঘোষ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ভারতীয় সংবিধানের মূল সুর যে 'রাষ্ট্রের চোখে প্রতিটি নাগরিক সমান' — একথা মেনে নিয়েও বললেন ঃ- "ভারত অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রের থেকে তাই এত আলাদা, অত্যন্ত বিশেষ রকমের,তাই ভারতের ক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সোজাসাপটা প্রচলন বিপজ্জনক হতেই পারে।"

শ্রীমতী ঘোষ 'অত্যন্ত বিশেষ রকমের' বিশেষণ প্রয়োগ করে অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রের থেকে ভারতবর্ষকে আলাদা বলেছেন তাতে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষ এই জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে কি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'? তাছাড়া ভারতবর্ষের এই চরিত্র হঠাৎ করে তৈরী হয়েছে এমন নয়। এই চরিত্রের কথা মাথায় রেখে কিছু রাষ্ট্রনেতা বিশেষ সম্প্রদায়কে

খিলাফত, পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার যে সব ঘুষ দিয়েছেন তাতেই কি শেষ রক্ষা হয়েছে? চানক্য শ্লোক — " ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ একাভিবর্ধতে", ব্যক্তিজীবনের মতো রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযুক্ত। বলা বাহুল্য পাকিস্তান সৃষ্টি এরই জ্বলন্ত উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এরই ফলে শুধুমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কেরালাতে আলাদা জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে মায়লাপূরম অঞ্চলকে।

আইন তৈরীর বিষয়টি তো সোজাসাপটাই হবে। শম্বুক গতিতে কোন বিধি কিভাবে তৈরী করা যায়? তাছাড়া যে কোনো দেশে যে কোনো বিধি বা আইন তৈরীর বিরুদ্ধে একদল লোক বিরোধিতার জন্য তো থাকবেই এবং এটিই স্বতঃসিদ্ধ। সতীদাহ তুলে দেবার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক যে সাহস দেখাতে পেরেছিলেন, স্বাধীন দেশের সরকার তা পারছেন না কারণ এদেশে গণতন্ত্রে কোন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর ভোট হারাবার ঝুঁকি নেওয়া সহজ নয়।

জনৈকা রুচিরা গোস্বামী গত ২৬শে জানুয়ারী, ২০০৬ এ 'আনন্দবাজার'-এ প্রবন্ধ লিখে প্রশ্ন তুলেছেন ঃ- "কার সমস্যা, কার মাথাব্যথা।" শ্রীমতি গোস্বামী স্পষ্টতই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বি.জে.পি এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলির দাবির প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

এধরনের মানসিকতা আরও বেশী বিপজ্জনক। রোগের ওষুধ জেনেও যেহেতু আমর শত্রু ঐ ওষুধেই নিদান খুঁজছে, তাই রোগী মরুক কিংবা বাঁচুক শত্রুর পছন্দের ওষুধ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই জাতীয় মানসিকতা এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতার নামে মৌলবাদকে উৎসঙ্গ করে বসে। এরাই বাড়ান অসহিষ্ণুতা এবং এ থেকে ক্রমশঃ তৈরী হয় ধর্মমোহ। ধর্মমোহে মানুষ মানুষকে মারে, নিজেও মরে — তাই তো স্বাভাবিক।

সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা ও ৪৪ নম্বর ধারার মধ্যে বিরোধ তৈরী করে যারা কুট তর্কে ৪৪ নম্বর ধারাকে সংশোধনের মাধ্যমে উৎপাটিত করতে চান, তাদের দাবিকে 'উদ্বেগজনক' মন্তব্য করে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন। এতে বলা হয়েছে ঃ- "যুক্তির অবতারণা কঠিন কাজ নহে, যে কোন নৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থানকেই যুক্তি, এমনকী সাংবিধানিক যুক্তি দিয়া প্রতিষ্ঠা করাই যায়। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে সে যুক্তি সদ্‌যুক্তি। মৌলিক অধিকার খুবই

গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু ঠিক তেমনই, কিংবা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ, ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় চরিত্রটি। ভূমিকা হইতে উপসংহার পর্যন্ত সংবিধানের সর্বত্র এই বিশ্বাস ওতপ্রোত ভাবে প্রোথিত যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের চোখে প্রতিটি নাগরিকই সমান, প্রতি নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র সমব্যবহার করিতে বাধ্য। কোনও বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের অংশ হওয়া মানে এই নয় যে রাষ্ট্রের নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের যে মৌলিক ও প্রাথমিক কর্তব্য, সেই কর্তব্যের চৌহদ্দির বাহিরে কেহ অবস্থান করিতে পারেন। যে কোনও আধুনিক দেশেই 'ল অব দ্য ল্যাণ্ড' বলিয়া একটি ধারণা আছে, যে কোনও নাগরিককে তাঁহার নিজস্ব ধর্মসম্প্রদায়, ভাষা সম্প্রদায় কিংবা অন্যান্য গোষ্ঠীচেতনার সঙ্গে সঙ্গে যে মৌলিক ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়া তবে নাগরিকত্বের মূল্য চুকাইতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার নাম নৈরাজ্য।"

সেমন্তী ঘোষ প্রমুখ এই যুক্তিতে 'সহজিয়া বি জে পি মার্কা যুক্তি'র তত্ত্বতালাশ করতে পারেন —— কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অন্তত বি জে পি'র মুখপত্র তো নয়ই।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বিচারিতার কথা লিখতে বসলে শেষ টানা সহজ হবে না। বুদ্ধিজীবীদের তোলা কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। কিছু প্রশ্ন তাদের তরফে তোলা হচ্ছে যার যৌক্তিকতা বিচার করাও প্রয়োজন। এমনই একটি বিষয় নিশ্চিতভাবেই মৌলবাদ।

মুসলিম মৌলবাদ বলে একটি শব্দ বরাবরই চালু ছিল। 'হিন্দু মৌলবাদ' বলে একটি শব্দ ইদানিং চালু করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য মুসলিম মৌলবাদের বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হবার প্রতিক্রিয়াতেই শব্দটির সৃষ্টি।

মৌলবাদ বা Fundamentalism এর অভিধানিক অর্থ — the strict following of true fundamental activities of any religion or system of thought.মৌলিক কিছু তথাকথিত আপ্তবাক্য সমগ্র গোষ্ঠীর বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে যখন সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে বিচারহীনভাবে সেই খাতে পরিচালিত করে তখনই মৌলবাদের ভিত্তি রচিত হয় বলা চলে। এই জাতীয় বিশ্বাস মোটামুটিভাবে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয়গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেই অর্থে ইসলাম, খ্রীষ্টান কিংবা আরো কিছু কিছু ধর্মীয়গোষ্ঠীর কিছু মৌলবিশ্বাসের জন্য তারা নিশ্চিতভাবেই মৌলবাদী। কিন্তু 'হিন্দু' নামে যারা অভিহিত তাদের মৌলিক

বিশ্বাস কি? আত্মা-পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুর যে মৌল বিশ্বাস তা পৃথিবীর বহু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষের সাধারণ বিশ্বাস। ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরপুত্র, নবী ইত্যাদি বহু ধর্মে যেমন 'একমেবাদ্বিতীয়ম', 'হিন্দু' ধর্মে তেমন নয়। 'একং সদ্ বিপ্রং বহুধা বদন্তি' কিংবা 'সর্বং ঋদ্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি' —— উপনিষদের এই তত্ত্বও অধিকাংশ হিন্দুর কাছে গুরুত্বহীন। তা সত্ত্বেও কুট তর্কে না গিয়ে যদি ধরে নেওয়া যায় যে হিন্দুদেরও কিছু মৌল বিশ্বাস রয়েছে যা একান্ত হিন্দুদেরই, তাহলে তারাও নিশ্চিতভাবে 'মৌলবাদী'র পর্যায়ে পড়বেন।

কিন্তু তাতে কি এলো বা গেলো?

নিজের মৌল বিশ্বাসে কেউ যখন বদ্ধ জলাশয়ে হাবুডুবু খান তখন বড়জোর তার সম্পর্কে করুণা হওয়া সম্ভব। কিন্তু মৌল বিশ্বাসে কেউ যখন অপর কোন মানুষকে, প্রয়োজনে তরবারীর সাহয্যে, নিজের বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে চান তখনই মৌলবাদ হয়ে ওঠে মানবসভ্যতার বিপদস্বরূপ। পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষই অপর ধর্মের মানুষকে নিজের ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত করতে সচেষ্ট। সেই চেষ্টায় মানুষ যে কখনো কখনো চরম নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতার পরিচয় দেয়নি তা নয়। কিন্তু এই জাতীয় কাজ ইসলামে যেমন ধর্মীয় স্বীকৃতি পেয়েছে তেমন অন্য কোনো ধর্মে ধর্মীয় স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং এখানেই অন্য সকল ধর্মের সঙ্গে ইসলামের প্রভেদ সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালান্তর প্রবন্ধমালার অন্তর্গত 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ- "পৃথিবীতে দুইটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র — সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।"

রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত বলে থেমে যাননি।

বলেছেন ঃ- "খ্রীষ্টান ধর্মাম্বলীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন ;তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবন পরিবেষ্টিত করে নেই।"

হিন্দুজাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ঃ- "........... তারা ধর্মের প্রকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয় —— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non violent non

co-operation ।"

খৃষ্টান মিশনারীরা তো বটেই, নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী 'মাদার টেরেসা'ও হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তনের কম চেষ্টা করেননি। ছল এবং কৌশল যে এই পরিবর্তনের চেষ্টায় একান্ত সহায়ক হয়নি তা নয়। কিন্তু মানতেই হবে 'বলপ্রয়োগ' করা হয়েছে অতি সামান্যই।

ঘৃণার মনোভাব নিয়ে, ধর্মগ্রন্থের কিছু নির্দেশ নিয়ে ইসলাম যেভাবে নিজেদের বিশ্বাস অপরের ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে তরবারীর সাহায্য নিয়েছে তা অন্য কোন ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেছে খুব সামান্য।

দেশের অধিকাংশ মানুষ 'কোরাণ-শরীফ' পড়বেন না। ফলে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় অবিশ্বাসীদের জন্য 'আল্লা'র কি নির্দেশ আছে 'কোরণ-শরীফ'-এ।

১। "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেয়ে থাকবে। (সূরা - তওবা, আয়াত ৫)

২। "অতয়েব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে। (সূরা - মহম্মদ, আয়াত ৮)

৩। "যাঁরা আল্লাতে ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা - ফাতাহ্, আয়াত ১৩)

এধরনের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো অসংখ্য আয়াত 'কোরাণ শরীফ'-এ রয়েছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না তথাকথিত কিছু হিন্দু শাস্ত্রেও শূদ্র বেদ শ্রবণ করলে তার কানের গহ্বর সীসা দিয়ে বন্ধ করে দেবার কথা বলে ঘৃণা ছড়নো হয়েছে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রীয় বিধানকে জাহান্নামে পাঠাবার বিষয়ে অধিকাংশ হিন্দুর মধ্যেই কোন দ্বিমত নেই।

ভারতবর্ষে যারা ইসলামকে সর্বব্যাপী করতে চেয়েছেন তাদের নিজেদের কথা থেকেই আমরা ইসলামীকরণের জন্য নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচারের কথা জানতে পেরেছি। নিজেদের কৃত সেই অত্যাচারের সানুপুঙ্খ বর্ণনায় এরা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণের মাধ্যমে ধর্মের অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন — এই বিশ্বাস ছিল তাদের দৃঢ়।

সিন্ধু অভিযানের নায়ক মহম্মদ-বিন-কাশিমের একটি চিঠি থেকে জানা যায়- রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর সেনানী ও প্রধান সেনাপতিকে বধ করা হয়েছে এবং নাস্তিকদের (হিন্দুদের) হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে। পুতুলপূজার মন্দিরগুলির জায়গায় মসজিদ তৈরী করা হয়েছে।

রাজা দাহিরের ছিন্নমুণ্ড সহ পাঠানো উপরোক্ত চিঠির উত্তরে পারস্যের মুসলমান রাজা তাঁর সেনাপতিকে জানিয়েছেন ঃ- "আল্লা বলেন - নাস্তিকদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা না করে তাদের শিরচ্ছেদ কর। এটাই আল্লার আদেশ।"

গজনীর মামুদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক আল উতবি লিখেছেন ঃ- "তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নগরগুলি অধিকার করেছেন, পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের হত্য করেছেন............।"

বখতিয়ার খিলজি বিহার অধিকার করে কিভাবে হিন্দুদের হত্যা করেন তার বর্ণনা রয়েছে 'তাবাকাত-ই-নাসিরি'র রচনায়।

বাবা সাহেব আম্বেদকার যথার্থই বলেছেন ঃ- "তাদের (মুসলমান শাসক) মধ্যে পারস্পরিক অসূয়া থাকলেও হিন্দুদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।"

নরহত্যা হিন্দুধর্মের নামে কখনো হয়নি, এমন অনৈতিহাসিক ধারণা যথার্থ নয়। কিন্তু এই হত্যার জন্য গর্ববোধ করা হিন্দুর পক্ষে সহজ নয়, কারণ হিন্দুসমাজে হত্যাকারীকে 'হত্যাকারী'র অধিক মর্যাদা দেয়নি। বিধর্মী হত্যা করার জন্য, তার জন্য বেহসতে 'আনতনয়না শয্যাসঙ্গিনী'সহ কোমল শয্যা রচনা করেনি।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে মৌলবাদ বহু ধর্মেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের মৌলবাদ যেভাবে মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছে অন্য যে কোন ধর্মে তার ব্যপকতা ছিল অনেক কম — হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তা প্রায় অস্তিত্বহীন।

হিন্দুরা কখনও আক্রমণকারী নন --- একথা অন্য কারও নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

"অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non violent non co-operation।" —— রবীন্দ্রনাথ একথা যখন লেখেন তখন ইতিহাস নির্ভরতা ছাড়া বাস্তব ঘটনা ও সত্য উপলব্ধ আপন অভিজ্ঞতার উপর আদৌ নির্ভর করেননি, সেকথা অন্তত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলার অবকাশ নেই।

ইতিহাসের দরজায় কড়া নাড়লে দেখা যাবে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পরে হিন্দুধর্মের প্লাবনে বৌদ্ধধর্মকে ভাসিয়ে নেবার যে কথা বলা হয় তা কিন্তু রাজানুগ্রহ কিংবা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাকেই একমাত্র সম্বল করেনি। অজাতশত্রু নেহাতই ব্যতিক্রম এবং তাঁর সম্পর্কেও যে সকল কাহিনী প্রচলিত, বহু ঐতিহাসিক তার যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

ইদানীং অবশ্য হিন্দুদের তরফে প্রতিআক্রমণের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কেন ভেবে দেখা হবে না স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে হিন্দুদের সম্পর্কে বলছেন ঃ- "প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারেনা।" — সেই হিন্দু আজ প্রয়োজনে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ছে। যেখানে তারা সংখ্যাগুরু, সেখানে পালিয়ে না গিয়ে মার দিতে চেষ্টা করছে। নৈতিকতার মানদণ্ডে প্রশংসাসূচক না হলেও বাস্তবতার মানদণ্ডে বিষয়টি একেবারেই নিন্দনীয় বলা যাবে কি?

এই বিষয়টি লক্ষ্য করেই কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে বলতে শোনা যায় — "হিন্দুরাও কম নয়।"

যেন কম হলেই ভালো হতো! মার খেয়ে প্রতিরোধ গড়ে না তুললেই হিন্দুর মহানুভবত্ব বজায় থাকতো, এ দায় যেন হিন্দুরই একচেটিয়া!

ইসলামের মৌলবাদ আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সামনে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বহু মসজিদ এবং মাদ্রাসা হয়ে উঠছে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া। (আনন্দবাজার - ২২.১.২০০৩ এবং ২৭.৩.২০০৩)

মসজিদ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে নানা ধরনের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। ওগুলি ধর্মাচারণের কোন কাজে লাগে তা বলতে পারবেন একমাত্র তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাই!

পশ্চিমী দেশগুলি তো বটেই এমনকী কমিউনিষ্ট চিনেও মুসলিম মৌলবাদীদের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। এবছরই চিনের জিনজিয়াং অঞ্চলে এক বাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ১২জন সাধারণ মানুষকে। একই দিনে উরুমকিতে মুসলিম মৌলবাদীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করছে দুজনকে।

ভারতবর্ষে ইসলামী মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তকে হিন্দুত্ববাদীদের কাজকর্মের প্রতিক্রিয়া বলে ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাতে অভ্যস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয়ই বলবেন না, চিনে মুসলিম মৌলবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে কমিউনিষ্ট মৌলবাদীদের কাজকর্মের প্রতিক্রিয়ায়।

অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে গেছে যে এমনকী চিন সরকার চিরাচরিত সীমান্ত সমস্যা অথবা বাণিজ্যবিষয়ক আলোচনা ছেড়ে ইসলামী মৌলবাদের বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় শুরু করেছে। (আনন্দবাজার - ২৫শে জানুয়ারী, ২০০৫)

হল্যাণ্ডের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক থিও ভ্যান গঘ তাঁর পরিচালিত 'সাবমিশন' ছবিটিতে একজন মুসলিম মহিলাকে জোর করে অসুখী দাম্পত্যের মুখে ঠেলে দেওয়ার বিষয়কে উপজীব্য করায় মুসলিম সম্প্রদায়ের রোষের মুখে পড়েন। ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তাঁকে গুলি করে হত্যা করে মুসলিম মৌলবাদীরা।

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, কমিউনিষ্ট চিন কিংবা মুসলমান প্রধান মিশর, ইন্দোনেশিয়াও আজ ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত।

পৃথিবীর যেখানে ইসলামের নামে সংঘটিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে সেখানেই মুসলিম মৌলবাদীরা অস্ত্র ধরেছে।

সলমন রুশদি, তসলিমা নাসরিন, শাহরিয়র কবীর —- এদের ঘটনা ব্যতিক্রম নয়।

মুসলিমদের মধ্যে কোরাণের জেহাদি তত্ব ও অবিশ্বাসীদের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অধিকাংশ মুসলমানদের বিশ্বাস এত বেশী যে মেদিনীপুর জেলায় সি.পি.এম এবং তৃণমূল কংগ্রেস যতই বিবাদ করুন না কেন, তসলিমাকে ঐ শহরে যেতে বাধা দেবার ব্যাপারে সবাই একমত। এবিষয়ে মেদিনীপুরের বামপন্থী পুরপ্রধান কিংবা তৃণমূলী নেতাদের বিবৃতি প্রমাণ করেছে মৌলবাদীদের চিন্তা এখন শুধু ছাপমারা মৌলবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। (আনন্দবাজার - ২৮.৪.০৫)

ধর্ম এমনভাবে মুসলমানদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে যে সমাজ সংস্কারের কথা বললেও ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। সংস্কারমনস্ক মুসলমানকে 'মুর্তাদ' বলে একঘরে করা হয় ধর্মগ্রন্থের বিধি মেনে।

সি.পি.এমের মইনুল হাসানকে 'অধার্মিক' বলে নির্বাচনে হারিয়ে দিচ্ছেন একশ্রেণীর মুসলমানেরা। মইনুল হাসানের অপরাধ তিনি 'মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা' পুস্তিকায় শরিয়াতি আইন পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন — ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি মুসলমান দেশের উদাহরণ টেনে এনে।

হিন্দুধর্মের প্রবক্তারা গো-হত্যার বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন কিংবা পূজায়

'বলি' বজায় রেখে গো-হত্যা বন্ধের জন্য আন্দোলন নিতান্তই ভণ্ডামী — (অবশ্য 'বলি' বন্ধ করা তথাকথিত ধর্মাচারণবাদীদের নিতান্তই রুচির বিষয়, গোহত্যা দেশের সামগ্রিক শান্তিশৃঙ্খলা সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত) — একথা বললে আমার বিরুদ্ধে ফতোয় জারি হবে না। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ব্যক্ত করলে তথাকথিত হিন্দু মৌলবাদীরা আমার নিন্দা করবেন, অভিসম্পাত দেবেন, কিন্তু 'শিরচ্ছেদ' করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করবেন না, এ একেবারে একশো শতাংশ নিশ্চিত।

এই যে সুনীল গাঙ্গুলী কৃষ্ণ, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে আপত্তিকর রচনা লিখে লেখার ব্যবসা ফাঁদলেন তার জন্য সুনীলবাবুর চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে কি তথাকথিত হিন্দুমৌলবাদীদের ফতোয়ায়? 'হিন্দু'প্রধান দেশে ইসলামের অন্যায়ের সমালোচনা করার জন্য মুসলিমদের বিক্ষোভের ভয়ে তসলিমা নাসরিনের যাতায়াত নিরাপদ করতে পুলিশী পাহারা নিতে হলো।

সরস্বতীর নগ্ন চিত্র আঁকার জন্য মকবুল ফিদা হুসেনের সমালোচনা হলেও তাঁকে পুলিশী পাহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হয় না তথাকথিত 'হিন্দুমৌলবাদী' অধ্যুষিত আহমেদাবাদ, মুম্বই কিংবা ভোপালে।

সারা পৃথিবী জুড়ে যে ঝড় উঠেছে তা থেকে বাঁচবার জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বালিতে মুখ গুঁজে নিস্তার পাবেন না। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি 'হিন্দু মৌলবাদ' থেকেও থাকে তাহলেও বিশ্বত্রাস মুসলিম মৌলবাদের সঙ্গে একে মিলিয়ে মৌলবাদের প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে মানুষকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করলে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও বিপদগ্রস্ত করবেন।

হিন্দুসমাজে এমনকী বস্তুবাদী নাস্তিক চার্বাক দর্শনের স্থান আছে। হিন্দুধর্ম বলে যা বলা হয় তা মৌলবাদী হলে মূল স্রোত থেকে সরে যাওয়া শাক্যমুনিকে অবতারের মর্যাদা দিতে পারত না। মনে রাখতে হবে আধুনিকতায় বিশ্বাসী একালের খৃষ্টধর্মও প্রোটেস্টান্ট মার্টিন লুথারকে মেনে নেয়নি। ইসলামও বাহাই, সূফিকে ধর্মদ্রোহীতা বলেই চিহ্নিত করেছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইসলামী মৌলবাদ ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বিলেত কিংবা আমেরিকাকে খুব শীঘ্রিরই 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা এ দেশকে 'দার-উল-হারাব্' থেকে 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করার জন্য আদর্শ।

এদেশে প্রতিবেশী মুসলিম দেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের একান্ত অনীহা, ভারতবর্ষের সংবিধানের ৪৪নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানী বিধি তৈরীতে মুসলমানদের একটি বড় অংশের বাধাদানে রাজনৈতিক দল ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ইন্ধন জোগানো ছাড়াও প্রকাশ্যে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ চালানোর যে সুবিধা —— তা নিশ্চিতভাবে ইসলামী মৌলবাদের বড় সহায়।

রিয়াধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আহমেদ টোটেনজী তো উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে জামাত-ই-ইসলামের অনুষ্ঠানে তাৎপর্যভাবে উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষে মুসলমানরা বিশ থেকে পঁচিশ কোটিতে পৌঁছলে এদেশে ইসলামী আইন স্থায়ী করা কঠিন হবে না।

ধর্মের আফিং-এ বুঁদ হয়ে থাকা ইসলামী মৌলবাদের স্বরূপ বুঝতে হলে ‘কোরাণ শরীফ’ ও ‘হাদিশ শরীফ’-এর আলোচনা অবশ্যম্ভাবী ভাবে চলে আসে। সারা বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা যেভাবে ধর্মকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে, তার মুল অনুপ্রেরণা কোথায় তা বোঝার জন্য কোরাণ-হাদিশ-এর পর্যালোচনা প্রয়োজন।

একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে ‘কোরাণ শরীফ’ — যা সমগ্র মুসলমান সমাজের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়জীবনের প্রধান প্রেরণা সেই গ্রন্থখানি আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত অগ্রহনীয়।

একথা একশ্রেণীর সমালোচকের তরফে বলা বয়ে থাকে যে ‘কোরণ শরীফ’-এর যা কিছু ভালো তা নিতান্তই আপতিক। নবীর মাধ্যমে আল্লার যে বাণীর কথা বলা হয় তা নিতান্তই নবীর ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। পালিত পুত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নাবকে বিবাহ করার বিষয়ে নবীর প্রতি আল্লার আধ্যাদেশের বিষয়টি উত্থাপন করে সমালোচকেরা তাঁদের যুক্তির ভিত্তি রচনা করেন। তাঁদের যুক্তি যদি মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও একথা কিভাবে অস্বীকার করা যাবে যে একজন এমনকী খুব অসৎ মানুষও যখন ‘ভালো’ রামকে ভালো বলেন তখন তিনি অসৎ বলেই রাম ‘খারাপ’ হয়ে যেতে পারে না। সমালোচনাকেও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

কিন্তু ‘কোরাণ শরীফ’-এর সমালোচকদের এ বক্তব্যও যথার্থ যে ‘কোরাণ শরীফ’-এ যেভাবে অন্যধর্মের মানুষদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করা হয়েছে, তাদের জন্য ইহজগতে তো বটেই, পরজগতেও শাস্তির আয়োজন করা হয়েছে,

তা গ্রন্থখানির যাবতীয় ভালোকেও কলুষিত করেছে। ভুলে গেলে চলবে না ভার তবর্ষে খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন করেও খিলাফতী আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন মহম্মদ আলি বলেছেন ঃ- "আমার ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে আমি একজন ব্যভিচারী ও পতিত মুসলমানকে শ্রী গান্ধীর চেয়ে ভালো বলে মনে করি।"

গান্ধী মুসলমান প্রেমিক হলেও মুসলমান ছিলেন না বলেই আলি গান্ধীকে নিকৃষ্ট বলেছেন।

বলা বাহুল্য মুসলমানের এ মনোভাবের প্রেরণা তো কোরাণ শরীফেই রয়েছে। সুরা 'বাকারাহ্' অন্তর্ভুক্ত ২২১ সংখ্যক আয়াতে ইসলামে অবিশ্বাসী স্ত্রী ও পুরুষকে, ইসলামে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের চাইতে নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করার নির্দেশকে যদি অমুসলমানের প্রতি মুসলমানের মনোভাবের প্রেরণা হিসেবে দেখা হয় তাহলে আদৌ কোনো ভুল হবে কি?

কাজেই যুক্তি দিয়েই 'কোরাণ শরীফ' আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। মুসলমান সমাজকেও এবিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের প্রতি যত বেশী অবিশ্বাস, যত বেশী ঘৃণা, মৌলবাদ সেখানেই তত বেশী শক্তিশালী।

একথা সকল ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া মৌলবাদ যত পুষ্ট হবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। তা যদি মৌলবাদ না-ও হয়, মৌলবাদের চাইতে কম ভয়ংকর কিছু হবে না। কেননা তার ভিত্তি রচিত হবে অবিশ্বাসের ওপর।

হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির দোহাই দিয়ে কিছু তথাকথিত প্রগতিবাদী ও একদেশদর্শী বুদ্ধিজীবী যেভাবে সকল সাম্প্রদায়িক সমস্যার দায় হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন তা শুধু নিন্দার্হ-ই নয়, অপরিনামদর্শীতারও চরম নিদর্শন।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এদেশে নতুন নয়। মুসলমান হিন্দুকে মারে, ইদানীং হিন্দুও মুসলমানকে মারছে। হত্যাকারী যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, তার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন মনুষ্যত্বের স্বার্থেই। হত্যা যখন সংঘটিত হয় তখন হত্যালীলার নৃশংস বর্ণনায় হত্যা অপরাধের মাত্রায় যেমন ইতরবিশেষ ঘটনা, তেমনি 'হত্যা'র নিরাড়ম্বর বর্ণনায় হত্যা অপরাধ লঘু হয়ে যায় — এমন নয়। এদেশের দাঙ্গার বর্ণনায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুধর্মাবলম্বী হত্যাকরী কৃত হত্যার অনুপুঙ্খ বিবরণ ধরতে গিয়ে কীভাবে বহু সময় এমনকী মিথ্যা এবং

অর্ধসত্যের উদ্ভাবনে নিরত হন, তা ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি। কিন্তু কোন বর্ণনায় হত্যাকরী মুসলমানের কৃত হত্যাবিবরণ স্থান পেতে দেখেছেন কি কেউ? হিন্দুকে নারী ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও মুসলমানরা এবিষয়ে যেন একান্তই অনীহ।! যদিও সমগ্র দেশের সর্বকালের পরিসংখ্যান বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করছে।

কোন সংবাদপত্র কিংবা বর্ণনায় তার উল্লেখ থাকে না। কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই নানা সন্দেহ দেখা দেয় স্বাভাবিক কারণেই। তারা কি চান হিন্দুদেরকেই যাবতীয় নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি করে তুলে মুসলমান মনকে পুরোপুরি বিষিয়ে দিতে? তা না হলে দুই সম্প্রদায়েরই নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরে সামগ্রিকভাবে মনুষ্যত্বের অবনমন, ভুলুণ্ঠণকে চিহ্নিত করাই তো যথার্থ হতো।

অবশ্য এবিষয়গুলি আদপেই হিন্দু বা মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয় নয়। মূল সমস্যা ও তার কারণ অনুসন্ধান না করে একপেশেভাবে হিন্দুর সমালোচনা যে সহনশীল হিন্দুরও সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিচ্ছে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তা বুঝতে চাইছেন না। তাদের অপরিনামদর্শীতা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এক অনিবার্য সংকটের অভিমুখী করে চলেছে। আগামী পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে দেশবিভাগের সময়কালীন অবস্থা ফিরে এলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গ কিংবা অসমপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষকে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে যদি উদ্বাস্তু হবার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, তবে তাকে কোন আকস্মিক ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ নিয়মিতভাবেই রোপণ করে দেওয়া হচ্ছে।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের অভিযানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে ধর্মবিস্তারের পথে প্রথম ভারতীয়টি যেদিন ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই ইসলাম ভারতবর্ষের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বস্তুত ইসলামের সিন্ধুবিজয় পলাশী কিংবা ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্যের চাইতেও অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক লেনপুল যেভাবে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে "An episode in the history and of Islam, a triumph without result." বলেছেন, তা যথার্থ নয়। "ভারতে সেইদিনই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে

যেদিন প্রথম হিন্দুটি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল” বলে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন অখণ্ড ভারতের মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণে যে মন্তব্য করেছিলেন তা জিন্নার ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় বহন করছে।

আদতে ফারসী শব্দ ‘পাকিস্তান’ কথাটির অর্থ মনে রাখলে এবং সামগ্রিকভাবে অ-ইসলামিক দেশ দার-উল-হারাব্‌কে পবিত্র দার-উল-ইসলামে পরিণত করার ইসলামিক আদর্শের বিষয়টি জানলে পাকিস্তান সৃষ্টির ইসলামী যৌক্তিকতা খুঁজে পেতে কষ্ট হবার কথা নয়। এদেশে এখনও বেশীরভাগ মুসলমান পাকিস্তানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তা বোঝার জন্য বিশেষ কোনো খেলায় পাকিস্তানের সাফল্যে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা, আলোর ফোয়ারার মতো বিশেষ ঘটনামাত্র দেখার প্রয়োজন ঘটে এমন নয়, মুসলমান মহল্লাগুলিতে একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

পাকিস্তানের মোহাজিরদের প্রতি সরকারী ঘৃণার মনোভাবের ফলে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে পাকিস্তানে যাবার বিষয়ে কিছু মুসলমানরা যে মাঝে মাঝে অনীহা প্রকাশ করেন তাতে ভারতবর্ষের প্রতি তাদের ভালোবাসা ব্যক্ত হয় না, বাস্তব অবশ্যম্ভাবী অসুবিধার আশঙ্কাই তাতে বেশী ক্রিয়াশীল, তা বুঝতে গেলে নিতান্ত ‘অন্ধ’ কিংবা ‘কালা’ না হয়ে থাকাই যথেষ্ট। ভারতীয় আইন গ্রহণে সাধারণ মুসলমানের অনীহা, শরিয়তি আইন তার সমাজ ও নারীকে যতই ‘বদ্ধ’ করুক না কেন, সে সম্পর্কে এমনকী অতি শিক্ষিত মুসলমানদেরও আকর্ষণ, সাধারণভাবে ইসলামের প্রতি বদ্ধমূল আকর্ষণসঞ্জাত তা বলা বাহুল্য।

এই বিষয়টি এদেশে নেহাৎ নতুন নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির তৎপরতা নিয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলেও ছিল দেশের স্বাধীনতার চাইতেও ইসলামিক ঐক্যের প্রতি মুসলমানদের আন্তরিক টান। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মুসলমান স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন — একথা যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি তাদের মধ্যেও অনেকেই ইসলামের চূড়ান্ত সাফল্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বৃটিশদের ভারতবর্ষত্যাগকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। মহম্মদ আলি কিংবা সৌকত আলি, যাঁরা ব্রিটিশবিরোধী লড়াই-এ সামিল হয়েছিলেন তাঁদের কাছে খিলাফতই ছিল প্রধান আকর্ষণ। এমনকী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ —-কংগ্রেস সভাপতি

হিসেবে যিনি তাঁর ভাষণে স্বীকার করেছেন — "I am one of those who believe revival may be necessity in a religion but in social matters it is a denial of progress." — তিনিও মুসলমানদের গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকারের আদর্শের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ঐক্যের উপর নির্ভর করতে বলেছেন। কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছেন ঃ- "The powerful bonds of Islamic brotherhood and equality have protected them to a large extent from the weakness that flowes from social division. It is true that they number only one-fourth of the total population, but the question is not one of the population ratio, but of the large numbers and the strength behind them."

মৌলানা আজাদ আর এক জায়গায় স্পষ্ট বলেছেন ঃ- "I am Musalman and am proud of that fact. Islam's splendid tradition of thirteen thousand years are my inheritance. I am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance."

এই 'inheritance' এর মধ্যে 'হাদিশ' বা অন্য কিছু না থাকলেও 'কোরাণ শরীফ' আছে নিশ্চিতভাবে।

১৯৪৭ এর দেশবিভাগের সময় যে সমস্ত মুসলমান ভারতবর্ষের মূল অংশে থেকে গিয়েছিলেন তাদের বেশীরভাগই মৌলানা আজাদের মতোই 'ইসলামী ঐতিহ্য'কে সম্বল করেছেন। বলা বাহুল্য এই 'ঐতিহ্যের' পরিবর্তে ভারতীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করলে 'হিন্দু-মুসলমান' সমস্যার চেহারায় কদর্যতা অনেক কম হতো নিশ্চিতভাবেই।

বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকার তাঁর দূরদর্শীতায় উপলব্ধি করেছিলেন ঃ- "এতে সন্দেহমাত্র নেই যে (ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে) সংখ্যালঘু বিনিময় করাই সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার একমাত্র সমাধান। (Pakistan or The Position of India পৃষ্ঠা - ১১৬)

গান্ধী কিংবা নেহেরু প্রমুখ তাঁদের ভাবালুতায় আম্বেদকারের যুক্তি বুঝতে পারেননি। রাষ্ট্র পরিচালনায় ভাবালুতার স্থান কোন যুগেই ছিল না কারণ বাস্তবতার দায় সেখানে অনেক বেশী এবং সেটিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় কোন মহত্ব থাকতে পারেনা। আজ প্রয়োজনে আবারও দেশভাগ করার দাবি —– এমনকী জাতীয় আইনসভাতেও উত্থাপিত হচ্ছে. যা তৎকালীন রাষ্ট্রপরিচালকদেরই ভুলের ফল।

এদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদ মূলতঃ একশ্রেণীর মুসলমানের সক্রিয়তা ও একদলের নীরব সম্মতির মধ্যে দিয়ে মূর্ত্ত হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না মহম্মদ করিম চাগলা, আবদুল ওদুদ, রেজাউল করিম কিংবা ফৈয়জ খাঁনের মতো মুসলমানরা ভারতবর্ষের গৌরব। এই মুহূর্তে ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা মেনে নিয়েই পনেরো-কুড়ি কোটি মুসলমানকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কল্পনা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সেরকম কিছু কল্পনা এই মুহূর্তে আর একবার দেশবিভাগের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলবে মাত্র। মুসলমানকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইলে সে প্রক্রিয়াই তরান্বিত হবে। কাজেই মুসলমানকে ঘরের লোক না করে উপায় নেই। ঘরের লোকের দোষ-ত্রুটি যদি থেকে থাকে তাহলে তা বললেই যদি ঘরের লোক ঘর ভাঙতে উদ্যত হয় তাহলে বুঝতে হবে সে লোক আদতে ঘরের লোক-ই নয়।

তোয়াজী বুদ্ধিজীবীরা এই সত্যটি না মেনে তোয়াজ করাকেই ধ্যেয় করেছেন। অথচ এমনকী এদেশের কোনো কোনো মুসলমানও অন্যরকম ভাবেননি, তা নয়।

ঘরের লোকের দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করার কথা বলে সাহিত্য সমালোচক মীজানুর রহমান ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বুলবুল' পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা উল্লেখ করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মীজানুর সাহেব লিখেছিলেন ঃ- "হিন্দুসমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমনধারা নির্মম কশাঘাতও মুসলমান সমাজ অম্লানবদনে গ্রহণ করবে তা জোর করে বলতে পারি। বাংলার কথাসহিত্য সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

মীজানুর সাহেব বেশী পরিমাণেই আশাবাদী ছিলেন --- একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে সে পরীক্ষা আদৌ হতে পারেনি। একালের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বিষয়টির গুরুত্ব দেবেননা তা বলা বাহুল্য। মুসলমান ধর্মাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও তো সর্বজনবিদিত। আবদুল ওদুদ কিংবা রেজাউল করিমের মতো সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আর নেই। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, হোসেনুর রহমান কিংবা অন্যান্যদের ভূমিকা তো তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ও ইমরানা কাণ্ড নিয়ে তাঁদের নীরবতায় ও নিশ্চলতায় সুস্পষ্ট।

মার্কসবাদীরা সর্বক্ষেত্রে প্রগতিবাদী হিসেবে নিজেদের জাহির করলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার নানা পশ্চাদ্‌গামীতায় একেবারে নীরব। যদিও কিছু কিছু মার্কসবাদী লেখক ভারত ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। মার্কসবাদী প্রবন্ধকার নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ- "মুসলমানরা অবশ্য স্বকীয় চেষ্টায় পশ্চিম অংশকে মুসলমান ভারতে পরিণত করে নিয়েছেন, পূর্বে তা পারেনি বলে তার জীবনে এখনো একটা সংখ্যালঘু সমস্যা মৃদু আকারে বেঁচে আছে।" (বস্তবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা, পৃ-১৩২)

পশ্চিম বলতে লেখক সম্ভবতঃ পাকিস্তান ও পূর্ব বলতে ভারতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেয়েছেন। সংখ্যালঘু সমস্যাকে 'মৃদু' আকারের বললেও তা যে আদৌ 'মৃদু' নেই লেখক তা দেখে যেতে পারেননি।

যাইহোক, লেখক সংখ্যালঘু সমস্যার একটি কারণ সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ- "প্রথম কথা, ইসলামিক কেন, কোন সাম্রাজ্য-বিস্তারই তরবারীর সাহায্য ভিন্ন হয়নি। ................মুসলীম সম্প্রসারণও হয়েছে ঐ একই ধারায় এবং মুসলমান ইতিহাসকাররা সেকথা জাতীয় গৌরবের কাহিনী রূপে লিপিবদ্ধও করেছেন। তাছাড়া ঐস্লামিক বিশ্বভাবনা এর পরিপন্থী নয়।গোটা জগৎকে তা দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারাব্ এই দুই ভাগে ভাগ করে। দার-উল-হারাবকে স্বধর্মে আনার জন্য ধর্মশাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছে জেহাদের এবং বলেছে তাতে মৃত্যু হলে মৃতজন হবেন শহীদ, জয়ী হলে বিজেতা হবেন গাজী। বলেছে বিধর্মীদের হয় ধর্মন্তরিত করবে, নয় কোতলে আম বা সমূলে নিপাত করবে, আর অসম্ভব হলে তাদের জিম্মি করে রাখবে ও মুণ্ডশুল্ক নেবে। এই শুল্কের নাম জিজিয়া। ................. মাতৃদেবতা ও পিতৃদেবতাপূজক হিন্দুদের মুল্লুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এর প্রমাণ এত স্পষ্ট ও প্রচুর যে তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।" (বস্তুভাবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা পৃ-৫৩)

উপরোক্ত গ্রন্থটি সরকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত (রবীন্দ্র পুরস্কার - ১৯৮৪)। সেই কারণে ধরে নেওয়া যায় লেখকের উপরোক্ত বক্তব্যে সরকারীক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামপন্থী দলগুলির সায় রয়েছে কিংবা বিরোধিতা করবার মতো তথ্য হাতে নেই।

মাকর্সবাদী লেখকের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হলো, প্রথমত এদেশে সংখ্যালঘু সমস্যা রয়েছে এবং তা কিছু সুস্পষ্ট নীতি কার্যকর না করতে

পারার কারণে। প্রসঙ্গত কি হতে পারে সেই নীতি?

রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে হালকা ভাবে বলেছিলেন ঃ- "আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তা হলেই সম্ভব হয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে ওঠে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন — যা মূলত ভাববাচক। যেখানেই কবির ক্রিয়াবাচক বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন যে হিন্দুর পক্ষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া মুসলমানের সঙ্গে মিলবার অন্য কোন উপায় নেই। (শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লেখা পত্র - কালান্তর,)

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখায় দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হচ্ছে এই যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূলে রয়েছে দার-উল-হারাব্ ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার ভাবনা ও বস্তুত ইসলামের এই ভাবনা মুসলমানরা বর্জন করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। অবিশ্বাস রয়ে গেছে। নতুন বিশ্বভাবনার সঙ্গে দার-উল-ইসলাম আর দুর-উল-হারাবের তত্ত্ব আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয় — এই কথাটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করে তোয়াজী বুদ্ধিজীবীরা অবিশ্বাসের মূলে জলসিঞ্চণ করে চলেছেন।

কাশ্মীরে সংখ্যালঘু হিন্দুরা বহু নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানেই মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে উঠছেন, সেখানেই নানা ধরনের সমস্যা তৈরী হচ্ছে। যেসব দাবি উঠছে যা ভারতবর্ষের সামগ্রিক ঐক্যের পক্ষে বিপদস্বরূপ। ত্রিপুরাতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামপঞ্চায়েতের সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে গ্রামটিকে রাতারাতি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেছিল ভারতবর্ষের অন্নেপুষ্ট সেই গ্রামের মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। বাংলাদেশের পতাকাও তোলা হয়েছিল গ্রামে। পরে ভারতীয় সেনারা গিয়ে সে পতাকা নামিয়ে দেয়।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তো বরাবরই বিচ্ছিন্নতাবাদের এক ঘাঁটি। এ সম্পর্কে অভিযোগ শুধু হিন্দুত্ববাদীদের নয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষ; যাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রবল শত্রুও সম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করতে পারবেন না, তিনিও লক্ষ্য করেছেন ---- "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

বেশীরভাগ ছাত্র ভারত সম্বন্ধে নিরাগ্রহ এবং অল্পসংখ্যক পাকিস্তানী, যারা নিরাগ্রহ তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্র (এবং শিক্ষক) হালকা রকমের পাকিস্তানী। নানা রকমে পাকিস্তানের প্রতি এদের একটা টান রয়েছে।"

মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল কারণ হিসেবে যারা শুধুমাত্র শিক্ষার অনগ্রসরতাকে মূল উপজীব্য করতে চান তারা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। ইসলামের আইনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপরিচালনায় যারা যুক্ত তারা নিরক্ষর নন।

সম্প্রতি আরবের আদালতে সে দেশে কর্মরত জনৈক ভারতীয় নাগরিক আবদুল লতিফ নৌশাদের চোখ উপড়ে নেবার আদেশ দিয়েছে। নৌশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এক সৌদি নাগরিকের চোখে আঘাত করায় তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। বিচারের নামে এধরনের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ইসলামিক দেশগুলিতে যেভাবে চলছে তাতে আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এহেন অবস্থা ভারতবর্ষের হিন্দু ও অন্যান্য মানুষের মনে যদি অবিশ্বাস ও সন্দেহ বহন করে আনে এবং মুসলমানদের তরফে ব্যক্তিগত আইন রাখার পক্ষে যুক্তি খাঁড়া করা হয়, তখন শুধুমাত্র হিন্দুদের সমালোচনা করে সমস্যাকে ঠেকানো যাবেনা।

সংরক্ষিত অরণ্যে জীবজন্তু হত্যায় অভিযুক্ত হলে চলচ্চিত্র নায়কদের গ্রেপ্তার করলো পুলিশ অনেক ইতঃস্তত করে। নায়কদের তরফে বলা হলো মুসলমান বলেই তারা হেনস্তার শিকার।

ক্রিকেট খোলোয়াড় দল থেকে বাদ গেলেন খেলাধূলাতে অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য। খেলোয়াড় বললেন মুসলমান বলেই তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এধরনের মনোভাব হিন্দুভাবনাকে আহত করছে তা বলা বাহুল্য। সংখ্যাগুরু বলে তার সকল ভাবনা অগ্রাহ্য করা হবে, হিন্দুরা চিরদিন তা মেনে নেবেন এমন ভাবা ভুল।

তোয়াজী বুদ্ধিজীবীরা যে পথ ধরেছেন সে পথ কখনো সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের সহায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রমুখ কেউই এই ধারার মানুষ ছিলেন না। হিন্দুর দোষত্রুটির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সবাই মুসলমানের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন — হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই তাঁদের কাছে দেশের মানুষ হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছেন বলে।

সম্প্রতি তাই তাঁদের ওপরও আক্রমণ আসছে বিভিন্ন মহল থেকে।

রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি, বড়লোকের কবি বলা হয়েছে। এমনকী মার্কসবাদী তাত্বিক নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তো রবীন্দ্রনাথকে জারজ সংস্কৃতির (Bustered Culture) প্রতিনিধিও বলেছেন। ইদানীং রবীন্দ্রনাথকেও সাম্প্রদায়িকও বলা হচ্ছে। কিছু তোয়াজী বুদ্ধিজীবী তো বটেই, সাংবাদিকেরাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির আচ্ছন্নতা খুঁজে পাচ্ছেন।

২০০৩এর ১৭ই অক্টোবর তারিখের 'দেশ' পত্রিকাতে অশ্রুকুমার শিকদার বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক প্রশান্তকুমার পাল রচিত রবিজীবনী (৯ম খণ্ড) গ্রন্থের সমালোচনা (Review) করেছেন। অশ্রুবাবু, প্রশান্ত পালের রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও একহাত নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দিয়েছিলেন, এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত রাজন্যবর্গের কাছ থেকে অর্থ আমদানির প্রত্যাশায় —— রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ হেন অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করেছেনেন অশ্রুকুমার। কালিদাস নাগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি অশ্রুবাবুর এই ধারনার কারণ হলেও মনে রাখা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ কোন গড়পড়তা মানুষ ছিলেন না।

অশ্রুকুমার লিখেছেন ঃ- "এই সব সংসর্গের ফলে হয়তো হিন্দুজাতির বর্তমান অবস্থা ও উন্নতি বিষয়ে তিনি লিখেছেন। আর তাতে হিন্দু মহাসভা উৎসাহিত হচ্ছে।"

বলা বাহুল্য হিন্দুজাতির উন্নতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কিছু লিখেছেন অশ্রুকুমারের তা ভালো লাগেনি। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে অশ্রুকুমার এমনকী রবীন্দ্রনাথের সংসর্গদোষ আবিস্কার করেছেন!

অশ্রুবাবুর সমালোচনা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয়না হিন্দুদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁর মনোপীড়ার কারণ।

প্রশান্তবাবু 'রবিজীবনী'তে তৎকালীন সমাজকে অনুধাবন করতে গিয়ে সামাজিক সমস্যাকে এড়িয়ে যাননি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কবিষয়ক নানা বিষয়ও তাঁর আলোচনায় এসেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনীতি যে হিন্দু-বিরোধিতাকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে এই ঐতিহাসিক সত্যটি উল্লেখ করায় অশ্রুবাবু, প্রশান্তবাবুর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক, কট্টরপন্থী ও অপ্রাসঙ্গিক বলে বিশেষিত করেছেন। বস্তুত ঠিক এখানেই 'রবীন্দ্রনাথের সংসর্গদোষ' আবিস্কারের

পেছনে অশ্রুবাবুর মনোভাব আঁচ করা যায়।

'দেশ' পত্রিকাতেই অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ সংকলিত 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ঃ'রবীন্দ্র সংগ্রহ' গ্রন্থটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, বক্তৃতার অংশ, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন। আলোচনার জন্য সেগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন।

১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ- "সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই ভগবানকে পূজার ক্ষেত্রে জাতের বেড়ায় বিভক্ত করে রাখা হয়েছে — অর্থাৎ যেখানে শত্রুরাও মেলবার অধিকার রাখে, হিন্দুরা সেখানেও মিলতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি যদি এপর্যন্ত হতো তাহলে হয়তো অনির্বাণবাবুর আপত্তি হতো না। অনির্বাণবাবুর ভাষায় ঃ- "জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ বৈষম্য আর বিরোধে জর্জরিত হিন্দুসমাজের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ আজীবন কতখানি অবিচল ও অনলস ছিলেন, সমস্ত মানুষের মিলনের কথা তিনি কতবার বলেছেন, সে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই।"

কিন্তু অনির্বানবাবুর ভাগ্যে শেষরক্ষা ঘটেনি। কারণ ঐ চিঠিরই একস্থানে রবীন্দ্রনাথ, "এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদে হিন্দুরা পদে পদে পরাভূত, তারা সর্বজনের ঈশ্বরকে খর্ব করে নিজেদেরই পঙ্গু করেছে।" — বলে যে বাক্যটি লিখেছেন অনির্বাণ তাতেই আবিস্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্র্যাগমাটিসম্ (Pragmatism) — কৌশলী বাস্তববুদ্ধি।

অনির্বাণবাবুর ভাষায় ঃ- "মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য অনৈতিক বলেই নিন্দনীয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল সেই কারণে চিন্তিত নন। 'এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদ' হিন্দুদের দুর্বল করে ফেলেছে. এই কারণেই তিনি উদ্বিগ্ন।"

স্পষ্টতই অনির্বাণ যে ইঙ্গিত করতে চাইছেন তা তথাকথিত সম্প্রীতিবাদী বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের পক্ষে স্বাভাবিক। 'হিন্দু' সম্পর্কে যে কোন ভাবনা যে অতীব নিন্দনীয় তা আজ আর কার অজানা? অনির্বাণ তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'সাম্প্রদায়িক হিন্দু'কে খুঁজে পেতে চেষ্টা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমান- বিষয়ক ভাবনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ধারকাছ দিয়ে যাননি।

অনির্বাণবাবু তাঁর এই পর্যালোচনাতেই একস্থানে রবীন্দ্রনাথের মতামত উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলছেন ঃ- " 'আভ্যন্তরিক বলে বলি' হলেও সামাজিক

ও অর্থনৈতিক ভাবে বাঙালি মুসলমান হিন্দু বাঙালির চেয়ে অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ, সেখানে তাকে সমান হয়ে নিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বলেই এ-ও লক্ষ্য করেছেন ঃ- "মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ?"

এদেশে যদি একজনও এমন মানুষ থেকে থাকেন যিনি বিশ্বসংসারের যাবতীয় বিষয়ে বিচারশীল ভাবনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে' নিজের রচিত এই গানটির মতোই যে কোনো চিন্তা-ভাবনাই তাঁর কাছে আপেক্ষিক সত্যের রূপ ধরে এসেছে। ফলে কোন বিষয়ই একতরফা নিন্দা কিংবা নির্বিচার স্তুতি লাভ করেনি তাঁর কাছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের সকল রচনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। উদাহরণ হিসেবে 'রাশিয়ার চিঠি'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। রাশিয়াতে যা দেখেছেন কবি তার অনেক কিছুই তাঁর ভালো লেগেছে, কিন্তু সে বিষয়ে শেষকথা বলার সময় আসেনি — এমন কথা বলেছেন সর্বত্র। রবীন্দ্ররচনার এই বৈশিষ্ট্য আপাতভাবে অনেকের কাছে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও, বস্তুত রবীন্দ্ররচনার যদি না-ও হয়, রবীন্দ্রভাবনার সর্বোচ্চ শক্তি এটিই। একজন যথার্থ যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে কোনো বিষয়ে তাঁর 'ফতোয়া' দিতে চাননি কবি — মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধই এর কারণ।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর জন্য ভেবেছেন, মুসলমানের জন্যও ভেবেছেন। হিন্দুর দোষত্রুটি জানাতে দ্বিধা করেননি, মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে গা বাঁচাতে চাননি। মজার বিষয় এই যে, অনির্বাণবাবুর মতো মানুষদের কাছে হিন্দুর জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচায়ক, মুসলমানের জন্য ভাবনা যথার্থ। বুঝতে অনুবিধা হয়না 'Charity begins at home', প্রাথমিক পর্যায়ে শেখা এই ইংরেজী প্রবাদটিতে যাদের একান্ত অনীহা অনির্বাণবাবু তাঁদেরই একজন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে আবদুল করবি রচিত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের পর্যালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ- 'ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই ইতিহাসবোধ অনির্বাণবাবুর পছন্দ নয়। তিনি লিখেছেন ঃ- "সেই ঐতিহাসিক আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রবল মুসলমানের হাতে দুর্বল

হিন্দুর পরাজয়ের এই 'ঐতিহাসিক' স্মৃতি আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।"

এই বক্তব্যে অনির্বাণবাবু কি বলতে চাইলেন তা স্পষ্ট নয়। হয় তিনি এই স্মৃতিকে মিথ্যে বলতে চেয়েছেন, নতুবা এই স্মৃতি নিয়ে তাড়িত হবার অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন।

অনির্বাণবাবু যদি প্রথমে উল্লিখিত ভাবনাটির কথা বলে থাকেন, তবে তাঁর সাথে তর্ক বৃথা। শুধু এটুকু বলা যাক যে সুলতান মামুদ তাঁর তিরিশ বছরের রাজত্বকালে এক-আধবার নয়, সতেরো বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেছিলেন আর জয়পালরা আত্মহত্যা করেছেন অথবা নিহত হয়েছেন — ইতিহাসের এই তথ্য এমনকী মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরাও অস্বীকার করতে পারেননি। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে এমন ঘটনা সম্ভব হতো?

অনির্বাণবাবু যদি স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাহলেও বিশ্বের নানা ঘটনা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকার সামিল হয়। ইতিহাসের শিক্ষা ভুললে কি হতে পারে ভারতবাসীর থেকে তা বেশী কে জানে? প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। হিন্দু দুর্বল বলেই দেশভাগের পর পাকিস্তান প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে, বাংলাদেশ শনৈঃ শনৈঃ সে পথে এগিয়ে চলেছে। হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে উল্টোটা হয়নি। এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে না — এই তত্ত্বে দুয়ো দিয়ে অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জবানিতেই জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত তিনটি জেলায় মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং পূর্ব দিনাজপুর মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছেন। যদিও বেসরকারী বিশ্বস্ত সূত্র অনুযায়ী নদীয়া, দক্ষিণ ২৪পরগণা এবং উত্তর ২৪পরগণাতেও মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ অতিক্রম করবে খুব শিগ্গিরই। মুসলমানরা এদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোর খাটাতে পারছেন। মুসলমান প্রধান জেলা হচ্ছে, মাদ্রাসায় রাষ্ট্রবিরোধী ঘাঁটির অস্তিত্ব জেনেও সরকারকে চোখ বুজে থাকতে হচ্ছে, শাহবানু মামলায় বিচারব্যবস্থার ইতিবাচক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের ক্ষোভে প্রলেপ দিতে নানা রঙের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কলকাঠি নাড়া এবং বিচারব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন অনির্বাণবাবুরা নীরবে সহ্য করছেন তো প্রবল মুসলমানের ভয়েই। ভয় দেখিয়ে অথবা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমেই তো মানুষের মুখ বন্ধ করা যায়, অনির্বাণবাবুরা নিশ্চয়ই উৎকোচ পাননি।

রবীন্দ্রনাথ যখন হিন্দুদের 'প্রবল' হয়ে উঠতে বলেন তখন তিনি তা মুসলমানদের মহড়া নেওয়ার জন্যই বলেন, অনির্বাণবাবু এমন কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের মহড়া নেবার কথা কদাচ বলেননি। যদি ধরেও নেওয়া যায় অনির্বাণবাবুর ধারণা ঠিক তাহলেও নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথ তা বলেছেন দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের স্বার্থেই। লিখেছেন ঃ- "ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।"

দুর্বলের সঙ্গে সবলের ঐক্য সম্ভব নয়, এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও রবীন্দ্রনাথের থাকা অনুচিত ছিল বলে মনে করেন অনির্বাণবাবু!

"কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় যে মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই।" — রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় ভাবনা তাঁর দীর্ঘ ও অভিজ্ঞতাবহুল জীবনে বিশেষ বদলায়নি। এমনকী প্রায় শেষ পর্যায়ে হেমন্তবালা দেবীকে দুঃখ করে লিখেছেন ঃ- "হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ তোমার ছেলেমেয়েদের দুর্বল স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে একদিন তুমি চলে যাবে। কিন্তু সে কী ভবিষ্যৎ, ভেবে দেখো।"

মুসলমান আধিপত্য, রাজনৈতিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন, কায়েম হলে ঘন্টা নেড়ে পূজা বন্ধ হবার ভয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবেই বিচলিত ছিলেন না। রাজদরবার যতই প্রাচুর্যের ছটায় উজ্জ্বল হোক না কেন, মুসলমান সমাজ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধকারের সাধনায় নিমগ্ন থেকেছে রবীন্দ্রনাথ তা যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন। সেই কারণেই আপাত তুচ্ছ বিষয় ধর্মান্তঃকরণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ- "সামাজিক অসম্মান থেকে বাঁচবার জন্যে প্রতিদিন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান এবং খৃষ্টান হতে চলেছে ---- কিন্তু ভাটপাড়ার চৈতন্য নেই। একদা ঐ তর্করত্নদের প্রপৌত্রমণ্ডলীদের মুসলমান যখন জোর করে কলমা পড়াবে তখন পরিতাপ করবারও সময় থাকবে না।" (হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্র, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৩)

রবীন্দ্রনাথ যখন একথা লেখেন তখন হিন্দুসমাজের দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথের

উদ্বেগের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। অনির্বাণবাবু সম্ভবত ইচ্ছে করেই সেই রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে চেয়েছেন যিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে হিন্দুর পক্ষে মুসলমানকে গ্রহণ করার বিষেয়ে যাবতীয় বাধার বিরুদ্ধে বলেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভালো হওয়া প্রয়োজন উভয়ের স্বার্থে, শুধুমাত্র একথা না বলে মনুষ্যত্বের জন্য, নৈতিকতার জন্য তা হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও তিনি জানতেন এই কাজ কত দুরূহ। তাই লিখেছেন ঃ- "ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফানিস্পত্তির কারণ ঘটবে।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ-৩১৮)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিস্তৃত কর্মবহুল জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে মতামত ব্যক্ত করলেন, অনির্বাণবাবু কলমের জোরেই তা নস্যাৎ করতে চান? রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতার বিপরীত কথা ফলাও করে ব্যক্ত করে মিথ্যাচার করবেন বলে আশা করেন অনির্বাণবাবুরা? বস্তুত তা কেরেননি বলেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ, বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সাংবাদিক নন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল রচনা সম্পর্কেই একথা বলতে পারেন ঃ- "আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি। লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহা যোগাইতে চেষ্টা করি নাই।"

অনির্বাণবাবুর ব্যাখ্যায় যা দাঁড়িয়েছে তাতে বোঝা যায় যে তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক হয়েও বৃহত্তর সামাজিক চেতনার স্তরে পৌঁছতে পারেননি।

অনির্বাণবাবু বলেছেন ঃ- "এ বিষয়ে আমরা রাজনীতিকদের অনেক সময় সমালোচনা করি, ব্যক্তিগত আচরণে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক নেতা কীভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমুদ্র মন্থন করে ক্ষমতার অমৃত আহরণ করেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।"

অর্থাৎ অনির্বাণবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষমতালোভী নেতাদের ভাবনা-চিন্তার কোন ফারাক নেই। রবীন্দ্রনাথও যখন 'ওরা' আর 'আমরা'র দল থেকে বের হতে পারেননি রামা-শ্যামাদের মতোই — তখন রামা-শ্যামাদের মতো রবীন্দ্রনাথকেও কুলোর বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দেবার সময় বোধহয় সুদূর পরাহত নয়।

দুর্বল হিন্দু ও সবল মুসলমান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা ভাবনায় অনির্বাণবাবু

তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) দৃষ্টির অস্বচ্ছতা লক্ষ্য করেছেন। অথচ মার্কসবাদী আলোচক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলছেন ঃ- "কে না জানেন দ্বাদশ শতকে যে মুসলীম অভিজেতারা ভারতে এসে শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেই তাঁরা মুসলীম সংহতি তৈরী করেন এবং বিশ শতকে আমরা দেখলাম তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট কোটি। আর দেখলাম স্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির দাবীদার রূপে পৃথক একটি দেশ গড়ে নিলেন।" (বস্তুবাদীর ভারত-জিজ্ঞাসা, পৃ- ৫)

রবীন্দ্রনাথকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অনির্বাণবাবু লিখেছেন ঃ- "...... রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সজাগ সচেতন মানুষের দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করতে পারে এবং তার ফলে ইতিহাসের বিচারে বা সমকালীন ঘটনার বিশ্লেষণে অনেক বিপজ্জনক ভুল হয়ে যেতে পারে।"

অনির্বাণবাবু রবীন্দ্রনাথকে সজাগ-সচেতনও বলেছেন, আবার তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্নও বলেছেন। স্বভাবতই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে কি রকম শোচনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সজাগ হয়েও দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলে সজাগ থাকার সকল আয়োজনই তো ব্যর্থ ---- অনির্বাণবাবুর রবীন্দ্রচর্চা শেষ পর্যন্ত এখানেই কলুর বলদের মতো নিজের বিশ্বাসের চারপাশেই ঘুরে বেড়ায়।

মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াকে তাঁর 'দৃষ্টির আচ্ছন্নতা' বলে বর্ণনা করে অনির্বাণবাবু লিখেছেন যে শঙ্করাচার্য নিয়োজিত হিন্দুমহাসভার বালকৃষ্ণ মুঞ্জের রিপোর্টের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

অনির্বাণবাবু বিদ্রোহের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার একটিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে একে নেহাতই অর্থনৈতিক এক সংগ্রাম হিসেবে চালতে চান। মোপলা বিদ্রোহের লক্ষ্য যেদিকে পরিচালিত হয়েছিল তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে উৎসুক অনির্বাণবাবু বল্লবেন কি তিনি যে মোপলা বিদ্রোহকে, হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মোপলাদের অর্থনৈতিক লড়াই বলছেন তাতে সাধারণ হিন্দুদের হত্যা করা হলো কেন?

মুঞ্জে রিপোর্টের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। বাবাসাহেব আম্বেদকার কি বলছেন দেখা যাক। আম্বেদকার তাঁর 'Pakistan or Partition of India' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ- "ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের কারণ বোঝা যায়,

কিন্তু যা বোঝা যায় না তা হল মালাবারের হিন্দুদের ওপর মোপলাদের ব্যবহার। মোপলাদের ভয়াবহ শিকার হল হিন্দুদের ভাগ্য। দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেনাবাহিনীকে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োগ না করা পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর মোপলাদের চরম অত্যাচার, যেমন - গণহত্যা, ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ধ্বংস করা, নারীনিগ্রহ, গর্ভবতী রমণীদের পেট চিরে দেওয়া, লুঠতরাজ, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ইত্যাদি চরম পাশবিক বল্গাহীন অত্যাচার চলল। এটা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নয়। এটা সর্বাত্মক ধ্বংসকাণ্ড। কত হিন্দু নিহত, আহত বা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে সংখ্যাটি বিশাল অঙ্কের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনির্বাণবাবু কিংবা বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মতো পুঁথি-পুস্তক ঘেঁটে মোপলা বিদ্রেহের স্বরূপ উপলব্ধি করেননি। স্বয়ং মালাবারে গিয়ে দেখে এসেছেন কীভাবে "চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত।"

এই প্রসঙ্গেই কবি বলেছিলেন ঃ- "আমি বিশ্বাস করতে পারিনা, মালাবারে ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার দরুণই তা আর সম্ভবপর হবে না।"

অনির্বাণবাবুদের কথা মতো মোপলা বিদ্রোহ শুধুই 'অর্থনৈতিক' হলে সেখানে মুসলমান জমিদাররা কেন আক্রমণের শিকার হলেন না?

অনির্বাণবাবুর ইতিহাস সচেতনতা 'অর্থনীতির' গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায় বলে আর একটু এগিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনা।

আসলে মোপলাদের বিদ্রোহ মূলত একটি ধর্মান্ধ আন্দোলন হয়ে উঠেছিল। মোপলা বিদ্রোহের সময়কালটি বিবেচনা করলে বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট হয়।

বাবাসাহেব আম্বেদকার উল্লেখ করেছেন কীভাবে কিছু খিলাফৎ নেতা মোপলাদের বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বললেন ঃ- "ধর্মের স্বার্থে মোপলারা যে সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছিল তাকে অভিনন্দন।"

খিলাফৎ নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়াকে নিছক হাল্কা ভাবে দেখা যাবেনা। নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোপলারা যে কত অবিচল ছিল তা পরবর্তী ঘটনাসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়। মোপলারা জনৈক আলি মুদালিয়াকে রাজা ঘোষণা করে খিলাফৎ পতাকা উত্তোলন করে এবং এরনাদ ও ওয়ালুরানাকে খিলাফৎ রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

ইসলামের 'জেহাদী' তত্ত্ব জানা থাকলে মোপলা বিদ্রোহকে নিছক 'অর্থনৈতিক' বলে চালাতে পারা যাবে না।

অনির্বাণবাবু রবীন্দ্রনাথকে 'সাম্প্রদায়িক' প্রমাণ করতে গিয়ে অদ্ভুত এক যুক্তি খাঁড়া করেছেন ঃ- "সুদূর মালাবার অঞ্চলের একটি বিরোধের সম্পূর্ণ চিত্র রবীন্দ্রনাথ জানবেন কি করে? না জানাটা অপরাধ নয়। কিন্তু এমন একটি গুরুতর বিষয়ে এমন একটি মন্তব্য করার আগে জানার চেষ্টা করা জরুরী ছিল। আসলে একটা পূর্বনির্ধারিত ধারণা নিয়ে কোনও ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়তো সব দিক জানার তাগিদ থাকে না।"

বাঃ! অনির্বাণবাবুর এ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে একটি মজার গল্প মনে পড়ছে।

একসময় রবীন্দ্রনাথ নাকি পরলোকচর্চা অর্থাৎ আমরা যাকে প্ল্যানচেট বলি, তাতে আগ্রহী হয়ে পরলোকগত জনৈক পরিচিত জনকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন যে পরলোকটি কেমন? উত্তরে সেই পরলোকগত ব্যক্তিটি নাকি জবাব দিয়েছিলেন ঃ-"ভারি মজাতো, আমি মরে যা জেনেছি তুমি না মরেই তা জানতে চাও?"

ঘটনার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবিত থেকে, সুদূর মালাবারে গিয়ে যা জানতে পেরেছেন, অনির্বাণবাবু আজ ঘটনার এত কাল পরে, এত দূরে থেকেই তা জেনে গেলেন! অবশ্য অনির্বাণবাবু জানার চেষ্টা অন্তত করেছেন আর নিজেই তো বলে রেখেছেন ঃ- "না জানাটা অপরাধ নয় ...........জানার চেষ্টা করা জরুরী, .........।"

রবীন্দ্রনাথ মালাবারের ঘটনাকে 'হিন্দু-মুসলমানের অসমকক্ষতা' বলে যে মন্তব্য করেছেন তা বাস্তব। তা না হলে মালাবারে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সত্বেও সেখানে 'খিলাফৎ' রাজ্য হওয়া সম্ভব ছিল?

রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর বাংলার বাতাসে মন্দ্রিত হতে দেখলে অনির্বাণবাবুর 'ইতিহাস সচেতনতা' সম্পর্কে বলার কিছু নেই।

'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র কথা বলে অনির্বাণবাবু বর্তমানে যে সংবাদপত্রে 'মসি' ও রবীন্দ্রনাথকেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার জন্য 'অসি' চালনা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, সেই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি 'ব্যঙ্গোক্তি' বর্ষণ করলেও, ১৯২৬ সালে ওঠা একটি বিতর্কের বিষয় উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সম্পর্কে ভেবে

দেখতে বলব।

নিতান্ত হাস্যকর বিতর্ক হলেও এর মধ্যে দিয়ে 'প্রবল মুসলমান' কি ভাবে 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'কে আতঙ্কিত করতে চাইছে শুধু তা নয়, 'বর্ধিষ্ণু মুসলমান'-এর মনেও শ্লাঘার সূচনা করছে — তা-ও বোঝা যাবে।

১৭৬১তে অনুষ্ঠিত পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক বিতর্কের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর তিন-এর দশকে। মুসলমানদের মত ছিল এই যুদ্ধে আহম্মদ শা আবদালি মাত্র একলক্ষ সৈন্য নিয়ে চার-পাঁচ লক্ষ মারাঠা সৈন্যকে পরাজিত করেছিলেন। অপরদিকে হিন্দুরা মনে করতেন এই যুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ছাড়া মারাঠাদের কোনোরকম জাতীয় বিপর্যয় ঘটেনি এবং যুদ্ধের এক দশকের মধ্যেই মারাঠারা উত্তরভারতে বিলুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের যুক্তি না মেনে, মুসলমানেরা যে হিন্দুদের চাইতে উৎকৃষ্ট তা প্রমাণ করবার জন্য মৌলানা আকবর শা খান, মদনমোহন মালবীয়াকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

মৌলানা বলেন ঃ- "মালব্যজি, পানিপথের ফলাফলের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যদি আপনি করেন তো (পরীক্ষার্থে) আমি, আপনকে একটি সহজ ও চমৎকার উপায় দেখাব। আপনার সুবিদিত প্রভাবকে কাজে লাগান এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও বাধা ছাড়া পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধ লড়ার জন্য অনুমতি দিতে ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করুন। হিন্দু ও মুসলমানদের সৌর্য ও যোদ্ধৃ মানসিকতার একটি তুলনামূলক পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত। যেহেতু ভারতে ৭ কোটি মুসলমান রয়েছেন। নির্ধারিত তারিখে ভারতে সাত কোটি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সাতশো মুসলমানকে নিয়ে আমি পাণিপথের সমতলে পৌঁছব। আর যেহেতু ভারতে ২২ কোটি হিন্দু রয়েছেন আমি আপনাকে বাইশশো কিন্তু আনতে দেব। সঠিক ব্যাপার হবে কামান, মেশিনগান বা বোমা ব্যবহার না করা। শুধু তরবারী, বর্শা ও বল্লম, তীর-ধনুক এবং ছুরি ব্যবহার করা যায়। হিন্দু বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ যদি আপনি গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে সদাশিব রাও বা বিশ্বেশ্বর রাও (পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এঁরা ছিলেন মারাঠাদের পক্ষে সামরিক সেনাপতি)-এর কোনও উত্তরাধিকারীকে আপনি সেই পদ দিতে পারেন যাতে তাদের বংশধররা ১৭৬১তে তাদের পূর্বপুরুষদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায়। কিন্তু যেভাবেই হোক একজন দর্শক হিসাবে আসুন, কারণ যুদ্ধের

ফলাফল দেখে আপনার মতামত পরিবর্তন করতে হবে। আর আমি আশা করি তখন দেশে বর্তমান বিরোধ ও লড়াইয়ের অবসান ঘটবে। উপসংহারে আমি বিনীতভাবে পেশ করতে চাই যে আমি সাতশো লোককে আনব তাদের মধ্যে যে পাঠান বা আফগানদের সম্পর্কে আপনারা মারাত্মকভাবে ভীত তাদের কেউ থাকবে না। তাই আমি আমার সঙ্গে শরিয়তের কঠোর অনুসারি ভাল পরিবারের ভারতীয় মুসলমানদেরই শুধু আনব।" (বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকার রচনা-সম্ভার, ভারত সরকার, পৃ-৩২৫)

রবীন্দ্রনাথ যখন 'প্রবল' মুসলমানের কথা বলেন তখন তাঁর সময়কার প্রাত্যহিক উদাহরণের বাইরে গিয়ে তত্ত্বকথা প্রচার করতে চাননি — অনির্বাণবাবু রবীন্দ্রনাথের এই অকপটতাকেও 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র আতঙ্ক বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কারও মন জুগিয়ে কথা বলেননি কখনো। রবীন্দ্রনাথ নিজে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বলেছেন ঃ- "আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ-বিদায় তাহাও আমাকে বার বার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। .............. কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই।"

অনির্বাণবাবুরা রবীন্দ্রনাথকে এখন যে দক্ষিণা দিয়ে চলেছেন তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও নগদ লাভের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও, জাতির পৃষ্ঠে তা বাহিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

অনির্বাণবাবু রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধ সাহিত্য ছাড়া গল্প-উপন্যাসের চরিত্র ও তাদের সংলাপ নিয়েও রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করেছেন।

বলেছেন ঃ-"গোরা উপন্যাসের 'ঋষিপ্রতিম' পরেশবাবুর সুসমাচার স্মরণীয়।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। এ সম্পর্কে কবি স্বয়ং যা বলেছেন তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেওয়ার অবকাশ অনির্বাণবাবু স্বয়ং করে দিয়েছেন।

অনির্বাণবাবু 'ঋষিপ্রতিম' পরেশবাবুর কথায় রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনার মিলও যদি পান তাহলেও রবীন্দ্রনাথ যে পরেশবাবু নন অথবা পরেশবাবু রবীন্দ্রনাথ নন, তা না বোঝার মতো অবিবেচক অনির্বাণবাবু অন্তত নন। কিন্তু গোরা উপন্যাসের 'খষিপ্রতিম' পরেশবাবুর কথা উদ্ধৃত করলেও 'ঘরে বাইরে'-র 'মানবপ্রতীম' নিখিলেশের কথা উদ্ধৃত করলে দেখতে পেতেন সেখানে অন্তত এমন একটি

বক্তব্য "............. পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই।............ মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে" — রয়েছে, যা 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র আতঙ্ক নয়, হৃদয় ও মস্তিষ্কের চলিষ্ণুতার দ্যোতক!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প-উপন্যাস কিংবা কাব্যসাহিত্যের চরিত্রের মুখের কথায় রচনাকারের 'মনস্তত্ত্বের' অনুসন্ধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ- "এদেশের কোন পরিচিত লোককে যদি নিন্দা করতেই হয়, নিন্দার অহেতুক আনন্দেই হোক্, অথবা কোনো উদ্দেশ্যমূলক কারণেই হোক্, অন্তত সেটা বিশ্বাস্য হওয়া চাই, নইলে বুদ্ধির প্রতি দোষ আসে।"

সমালোচনাকারীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন ঃ-"আমি সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে সব কথা বলানো হয়, সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্‌টে 'The Arch Fiend' বলেছেন ঃ-

"To do aught good never will
be our task
but ever to do ill our sole
delight."

সন্দেহ নেই কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু আজপর্যন্ত কোন ছাত্র বা অধ্যপক, কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিল্টনকে এ বলে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বর-বিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস লস্টকে উচ্ছেদ করবার প্রস্তাব এখনো শোনা যায়নি, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনোই শোনা সম্ভব হতে পারে না, জোর করে এমন কথা বলার মুখ আর আজ রইলো না।"

রবীন্দ্রনাথ এজাতীয় সমালোচনার একটা কারণও অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। লিখেছেন ঃ- ".............. তবে কি বাংলা দেশের পঙ্কিল মাটিকেই দায়ী করব? প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া কোনো রকম নৈতিক কারণ অনুমান করতেও সাহস করিনে।"

আদতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনায় এক নতুন ধারা

স্পষ্ট হচ্ছে, অনির্বাণবাবুর রচনা সে ধারারই প্রকাশ। শিল্পী-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকারদের সৃষ্টি নিক্তিতে মেপে দেখা হচ্ছে সেখানে কটি মুসলমান চরিত্র রয়েছে, মুসলমানের দোষত্রুটিকে উল্লেখ না করে সর্ববিষয়ে তাকে কত মহৎ করেক তোলা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় হিন্দু সমাজের পক্ষে মুসলমানকে গ্রহণের যাবতীয় বাধাকে তীব্র কশাঘাত করেছেন। লোকহিত প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ- "হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।"

নিজের জমিদারির সেরেস্তায় ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষের গদিতে বসে দরবার করেন, সেখানে একধারে জাজিম তোলা অংশে মুসলমান প্রজাদের বসবার স্থান নির্ধারিত করার বিষয়টি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের সমালোচনা করেছেন।

অবশ্য এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুর দ্বারা মুসলমানের স্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা যে আদতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথারই অঙ্গ এবং অনেক তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুর মতো মুসলমানের প্রতিও সম্প্রসারিত, তা উল্লেখ করেননি।

এবিষয়টি উপলব্ধি করবার জন্য বিপিনচন্দ্র পাল রচিত তাঁর আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থটির প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে।

বিপিনচন্দ্র হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ- "শ্রীহট্ট সাহা-প্রধান স্থান। শহরে সাহারাই ধনসম্পদে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ। ..........শহরের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকেরা ইঁহাদিগের সঙ্গে পানাহার করিতেন না। ..........ইহারা কর্মোপলক্ষ্যে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আসিলে যতক্ষণ ফরাস হইতে হুঁকো না সরান হইয়াছে, ততক্ষণ তাহাতে বসিতেন না। মুসলমানদের জন্য যেমন ফরাসের সম্মুখে স্বতন্ত্র চেয়ার বা কেদারা সাজান থাকিত, সাহাদের জন্যও সেই ব্যবস্থা ছিল।" (সত্তর বৎসর, পৃ-৬৯-৭০)

শুধু সাহারাই নন, বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন কিভাবে চর্মকার কিংবা ডোম ইত্যাদির কথা তো বাদই দেওয়া গেল, এমনকী সুবর্ণবণিক, যোগী ইত্যাদিরাও হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য ছিলেন।

এভাবেই 'জাতের নামে বজ্জাতি' সমগ্র হিন্দুসমাজকেই গ্রাস করেছিল এবং তার শিকার হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানরা —— আলাদা করে শুধু মুসলমানরা নয়। সমাজগবেষকরা এই বিষয়টির প্রতি নজর দিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের যাবতীয় বিষয় নিয়ে লিখে যাবেন — এমন আশা করা যায় না। কিন্তু যেখানে যা কিছু লিখেছেন তার পিছনে তাঁর বিচার এবং বিশ্লেষণ ক্রিয়াশীল থেকেছে। দু'কলম লিখেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা মতকে নস্যাৎ করার আগে বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপট শুধু হিন্দু আর মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত না রেখে, মানবিক মূল্যবোধগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত।

মুসলমান বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে মুসলমান পশ্চাদগামিতা। ইসলামের দর্শন যে এই পশ্চাদগামিতার বড় কারণ বহু বিশিষ্ট মুসলমান পণ্ডিত তা অনুধাবন করতে পারেন। বহুপূর্বে বেগম রোকেয়া মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ করতে গিয়ে, রোকেয়ার কথাতেই কুড়িয়েছেন "কাঠ মোল্লাদের অভিসম্পাত"।

ধর্মমোহকে সম্মান জানানোর কোনো কারণ নেই — এ যেমন হিন্দুধর্মের বিষয়ে সত্য, মুসলমানধর্মের বিষয়েও তার অন্যথা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তথাকথিত হিন্দুয়ানীর বিরোধিতা করতে গিয়ে যেভাবে, এমনকী মুসলমান ধর্মান্ধতাকেও উৎসঙ্গিত করা হচ্ছে, তা যে একান্তই আত্মঘাতী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তা বোঝেন না এমন নয়। কিন্তু অহেতুক (!) সত্যকে স্বীকার করে রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ নগদ বিদায়ের সম্ভাবনা নষ্ট করাকে বাস্তববুদ্ধি বলে মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের তা প্রয়োজন ছিল না বলে এখন তাঁরাও সাম্প্রদায়িকভাবনায় আচ্ছন্ন ছিলেন বলা হচ্ছে।